প্রিয় নাবীর কন্যাগণ
(রাযিআল্লাহু 'আনহুন্না)

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব।

সম্পাদনায় ঃ
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
মুমতায শারী'আহ্‌ বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব।
সাবেক শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট,
জামঈয়াতু ইহ্‌ইয়া ইত্‌তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত।
বর্তমান মুদার্‌রিস- মাদ্‌রাসাহ্‌ মুহাম্মাদীয়্যাহ্‌ আরাবীয়্যাহ্‌, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি প্রিয় নবীর কন্যাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুন্না)। বইটির আংশিক লেখা ও পূর্ণ বইটির সম্পাদনা করার তাওফীক দান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাগণের জীবনী সম্বন্ধে লেখা বই নাই বললেই চলে। তবে যে সকল বই-এ আংশিকভাবে তাদের জিবনী তুলে ধরা হযেছে তা প্রায় বেশির ভাগ সত্য-মিথ্যায় পরিপূর্ণ। সুতরাং অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও সেগুলির বাছাই করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমার ন্যায় একজন সদা ব্যস্ত গুনাহগার ব্যক্তির পক্ষে মাত্র কয়েকদিনের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠক বৃন্দের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। তাই আমি জনাব আব্দুর রহমান সাহেবের লেখা নবী নন্দিনী বইটির পূর্ণ সম্পাদনা করে ফাতিমা (রাঃ) জিবনী সংযোগ করে বইটি পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রকাশের পথে সব চাইতে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এর সুষ্ঠু সমাধান কল্পে ১ম সংস্করণ ও প্রকাশনা প্রসঙ্গে জনাব মারহুম মাওলানা আরিফ সাহেবের ছেলে মোঃ বাশীর সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উপর্যুপুরী আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

ইয়া রাব্বাল আলামীন! তুমি মুহাম্মাদ বাশীরকে তোমার হক পথের সম্যক অনুধাবন, তার প্রতি সঠিক আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো, একমাত্র তোমার তাওফীক প্রদানের উপরেই এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই সকল ভ্রান্তিকে ক্ষমা করে মুহাম্মাদ বাশীর সাহেবের এই সামান্যতম খিদমাতকে তার ও তার পিতা মারহুম মাওলানা আরিফ সাহেব ও মমতাময়ী মাতার জন্য পরলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের ওয়াসীলা করে দাও। আমীন

খাদিম

হাফেয হুসাইন (আবূ নুফাই)

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল-হামদুলিল্লাহ। দীর্ঘদিন পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে নবী নন্দিনী বইটি প্রিয় নবীর কন্যাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুন্না) নামে ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

আলোচ্য গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চার কন্যার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রিয় নবীর কন্যাগণের (রাঃ) সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলোচনা খুব কমই করা হয়েছে। হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেব নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদী থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংক্ষেপে অথচ খুবই সহজ বোধ্যভাবে ফাতিমার (রাঃ) জীবনী সংযোজন করে পূর্ণ বইটির সম্পাদনা করে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার শুকর যে, জনাব হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের সুষ্ঠু চিন্তায় ও আন্তরিক প্র'য়াস এবং বিশেষ উদ্যোগে বইটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ পেলো তাই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দু'আ করছি যেন মহান আল্লাহ তাঁকে এই উদ্যোগের জন্য পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের ওয়াসীলা করে দেন। আমীন। আরো দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'আলা এই প্রচারের বদৌলতে আমার মরহুম আব্বা মাওলানা মোঃ আরিফ সাহেবের ও মারহুমা আম্মার রুহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন

মোহাম্মাদ বাশীর

সূচীপত্র

প্রিয় নবীর-কন্যা– যায়নাব (রাঃ)

প্রিয় নবীর-কন্যা– রুকাইয়া (রাঃ)

প্রিয় নবীর-কন্যা– উম্মু কুলসূম (রাঃ)

প্রিয় নবীর-কন্যা– ফাতিমা (রাঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় নাবীর কন্যা– যায়নাব (রাযিআল্লাহু 'আনহুন্না)

যায়নাব (রাযিঃ)-এর জন্ম পরিচয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর প্রথম সহধর্মিণী খাদীজাতুল কুবরার মিলন-জাত সন্তান-সন্তুতির মধ্যে সর্বপ্রথম কে জন্ম গ্রহণ করেন– পুত্র কাসেম, না কন্যা যায়নাব এ নিয়ে মতভেদের কিছুটা অবকাশ রয়েছে। কিন্তু কন্যাগণের মধ্যে বড় যে যায়নাব এ সম্পর্কে কোনই মতভেদ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের মোটামুটি দশ বৎসর পূর্বে যায়নাব জন্ম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ৩০(ত্রিশ) এবং উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রাযিঃ)-এর বয়স ৪৫(পয়তাল্লিশ) বৎসর। যায়নাবের শৈশব সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। মহৎ-চরিত্র পিতা এবং গুণবর্তী ও ধনবর্তী মাতার স্নেহচ্ছায়ায় ও উত্তম লালন-পালন গুণে যায়নাব যে এ সময় আদর্শ কন্যা রূপে গড়ে উঠছিলেন– একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

বিবাহ ও স্বামীর মার্জিত আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই যায়নাব (রাযিঃ)-এর বিবাহ্ অল্প বয়সে তার আপন খালাত ভাই আবুল 'আস ইবনু রাবী' (ইবনু আবদিল উয্যা ইবনু আব্দি শামস ইবনু আব্দি মান্নাফ)-এর সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়।

শুধু যায়নাব (রাযিঃ)-এরই নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কন্যা রুকাইয়া (রাযিঃ) এবং উম্মু কুলসূম (রাযিঃ)-এর শুভ বিবাহ্ আবূ লাহাবের দুই পুত যথাকমে উৎবা এবং উতাইবার সঙ্গে আরও কম

বয়সে সম্পন্ন করে ফেলেন। কিন্তু নবুওয়াত লাভের পর আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মু জামীলা (হাম্মা-লাতাল হাতাব)-এর ইসলামের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে দুশমনীর কারণে তাদের কড়া হুকুমে উক্ত বিবাহ্ বন্ধন তালাক্বের মাধ্যমে ছিন্ন করে ফেলা হয়। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হবে।

এখানে যায়নাব (রাযিঃ)-এর বিয়ের কথা এবং প্রতিকুল পরিবেশেও স্বামী-স্ত্রীর একে-অপরের ভালবাসার গভীরতা এবং অটলতার কথা বর্ণনা হচ্ছে।

খাদীজা (রাযিঃ)-এর এক সহোদরা ভগ্নি ছিলেন যার নাম ছিল হালাহ। 'রাবী' ইবনু আবদিল উয্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এদের মিলনজাত ছেলের নাম আবুল 'আস। হালাহ মাঝে মাঝে বোন খাদীজার বাড়ীতে আসতেন এবং যায়নাবকে দেখতেন। যায়নাবের দৈহিক সৌন্দর্য, মিষ্টি মধুর কথা, বুদ্ধিমত্তা এবং আকর্ষণীয় চাল-চলন দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং ভগ্নি-ন্যাকে পুত্রবধু রূপে নিজ গৃহে নেয়ার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। অবশেষে তিনি তার বোনের নিকট একদিন বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং বলেন ঃ দু'জনে মানাবে ভাল।

হালাহ-এর প্রস্তাব শুনে খাদীজা (রাযিঃ) নিজে কোন মতামত ব্যক্ত না করে একদা সুযোগ বুঝে স্বামী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কথা তুলে ধরলেন। আবুল আস বুদ্ধি, সাহসিকতা, বীরত্ব, আচার-ব্যবহার সব দিক দিয়েই বর হিসেবে ছিল পছন্দনীয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং যথাসময় নিয়ম মাফিক বিবাহ্ সম্পন্ন হল। পূর্বেই বলা হয়েছে। এ বিবাহ্ কার্য সম্পন্ন হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে এবং তখন যায়নাব (রাযিঃ)-এর বয়স দশ বৎসরের নিম্নে।

যায়নাব (রাযিঃ)-এর বিয়ের পর ৪০(চল্লিশ) বৎসর বয়সে রাসূল ﷺ নবুওয়াতের মহা অবদান এবং রিসালাতের মহান দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর প্রতি প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট হতে দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ নাযিল হলঃ

"হে বস্ত্রাবৃত (কাপড়ে ঢাকা) রাসূল! উঠুন, সতর্ক করুন; আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন; ...." -(সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ১-১৩)।

তিন বৎসর পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ইসলামের প্রচার কার্য চালান হল। তারপর রাসূল ﷺ-এর অভিজ্ঞতা ও ধৈর্যধারণ ক্ষমতা যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল এবং মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে পৌঁছে গেল তখন নির্দেশ এল ঃ "হে রাসূল! আপনি প্রচার করুন যা আপনার উপর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তা।"
(সূরা আল-মায়িদাহ্ ৬৭)

আরও নির্দেশ এল "আপনি আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে সাবধান করুন" -(সূরা আশ্-শু'আরা ২১৪০)।

যায়নাব (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কলিজার টুকরা আর জামাতা আবুল 'আস নিকটতম আপন জন। যথা সময়ে তাদের নিকটও ইসলামের বাণী প্রচারিত হল। যায়নাব (রাযিঃ) সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। কিন্তু আবুল 'আস উক্ত আহ্বানে সাড়া দিলেন না। তিনি মুশরিকদের দলেই থেকে গেলেন। স্ত্রী সত্য ধর্ম ইসলাম ক্ববূল করলেন আর স্বামী পিতৃ পুরুষের মিথ্যা ধর্মেই অবিচল থাকলেন। তবু তাদের মধ্যে প্রাক ইসলামী বিবাহ্ বন্ধন অটুটই থেকে গেল। এর অনেকগুলো কারণ ছিল ঃ

প্রথমত ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর, **দ্বিতীয়ত** ঃ ইসলামের সে প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানরা ছিল খুবই দুর্বল, **তৃতীয়ত** ঃ মুসলমান ও মুশরিকের বিবাহের নিষিদ্ধতা সম্পর্কীয় আয়াত তখন নাযিল হয়নি। **চতুর্থত** ঃ রাসুলে কারীম ﷺ মাসলাহাতের কারণে বিবাহ্ বিচ্ছেদের পরিবর্তে বন্ধন অটুট রাখাই শ্রেয় মনে করেছিলেন এবং পরিণামে তা যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণপ্রদ প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ইসলামের সঙ্গে কুরাইশদের দুশমনী এবং বিরোধিতা যখন বেড়ে চললো, তখন কুরাইশদের কতক লোক আবুল 'আসের নিকট গিয়ে

যায়নাব (রাযিঃ)-কে তালাক্ব দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল, এমন কি তার উপর চাপ সৃষ্টি করে তালাক্ব দিতে বাধ্য করার জোর চেষ্টা চালাল। অবশেষে তাকে এ বলে প্রলোভিত করারও চেষ্টা করল, "তুমি আমাদের দুশমন মুহাম্মাদ ﷺ-এর মেয়েকে বিবাহ্ করেছ। তুমি তাকে তালাক্ব দাও। তার পরিবর্তে কুরাইশদের যে কোন সুন্দরী মেয়েকে তুমি পছন্দ কর, আমরা তাকেই তোমার সাথে বিবাহ্ দেবার ব্যবস্থা করব।"

আবুল 'আস তাদের সব যুক্তিতর্ক এবং প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে তাদের হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হল।

মুহাম্মাদ ﷺ এ সংবাদ শুনে খুশী হলেন। আবুল 'আস-এর মার্জিত আচরণ এবং সুস্থ বিচার বুদ্ধির জন্য তিনি প্রশংসা করলেন যা পরবর্তীতে আরও অনেক সময়েই করেছেন।

দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ বংশ এবং নিজ গোত্রে সে কুরাইশদের– যারা আল্লাহর একত্ববাদের কথা ভুলে গিয়ে শির্ক তথা পুতুল পূজার গুমরাহীতে লিপ্ত ছিল তাদেরকে– সত্য পথের সন্ধান দিলেন। ভ্রান্ত পথে চলার পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করলেন এবং এক আল্লাহর স্বরূপ তুলে ধরলেন। তিনি তাদের ডাক দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"হে লোক সকল! তোমরা শুনে রাখ, আল্লাহ এক, তাঁর কোনই শারীক নেই। তিনিই বিশ্ব জগতের খালিক ও মালিক– সৃষ্টা ও অধিশ্বর। তিনিই মানুষ এবং অন্য সব সৃষ্টবস্তুর অভাবমোচক– দুঃখ-কষ্টের অপসারক এবং বিপদউত্তারক। অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত-বন্দেগী কর, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। নিজ হস্তে তৈরী মূর্তিগুলোকে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী এবং সাহায্যকারী ভেবো না। আল্লাহকে ভয় এবং সমীহ করে চল আর গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর। অন্যথায় ক্বিয়ামাতের ভয়াবহ দিবসে তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।"

এই ছিল সেই বাণী যা শুনে মক্কার অধিবাসীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এ ধরনের বাণী যতই তারা শুনতে লাগল ততই তাদের উত্তেজনা ও ক্ষিপ্ততা বেড়ে চলল। যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাদের নিকট আদর্শ-চরিত্র ও বিশ্বস্ততম ব্যক্তি তিনি হয়ে উঠলেন তাদের সবচেয়ে অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি– ঘোরতর শত্রু। তারা তাঁর প্রতি ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু করে দিল। তিনি যে পথ দিয়ে চলাফেরা করতেন সে পথেই কাফিররা কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। তাঁর গলায় মোটা চাদর জড়িয়ে পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করত। কখনও বা আল্লাহর ঘর কাবা গৃহে নামাযে সিজদারত অবস্থায় রাসূলের উপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিত।

যায়নাব (রাঃ) তখন কিশোরী এবং বিবাহিতা। তিনি মহান পিতার উপর কুরাইশদের এই অন্যায় বর্বর আচরণে মর্মাহত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়তেন। তিনি অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন।

একদিনের একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

"মুদারিক ইবনু হারিস 'আমেদী (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে তিনি বলেন, ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে আমার পিতার সঙ্গে একবার হজ্ব করতে মক্কায় গিয়েছিলাম। মিনা প্রান্তরে আমি দেখতে পেলাম ঃ একটি লোক দাঁড়িয়ে, তাকে পরিবেষ্টিত করে আছে অসংখ্য লোক! আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে ঐ লোকটি যাকে এত লোকে ঘিরে রেখেছে? তিনি বললেন ঃ "এ হচ্ছে সেই পথভ্রষ্ট বেদ্বীন! যার নাম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সে তার বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম প্রচার করছে।"

এই কথাগুলো বলে আমার পিতাও ঐ সমাবেশের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে উপদেশ দিয়ে চলেছেন আর লোকেরা তাঁর কথা না শুনে উল্টো তাঁর প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারছে এবং ধূলোবালি নিক্ষেপ করে চলেছে! তারা এই অমানুষিক আচরণ চালাতে গিয়ে প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। ঠিক এমনি সময় আমরা

দেখতে পেলাম একটি সুন্দরী কিশোরী বালিকা ব্যথিত, বিচলিত এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় দৌড়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার হাতে পানির একটি পাত্র আর জামার বোতামগুলো খোলা। এই নিষ্কলঙ্ক মাসূম বালিকাটির পরিচয় সমবেত লোকদের মুখেই জানা গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল, ঐ দেখ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়েটি এসে গেছে। কিশোরী যায়নাবের তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত। বুযুর্গ পিতার ঐ অবস্থা দর্শনে কন্যা যায়নাব অত্যন্ত ব্যথিত। সহানুভূতি ও দরদভরা হৃদয় নিয়ে তিনি পিতার সাহায্যে সেখানে সমুপস্থিত। বুক ফেটে তার কান্না বেরিয়ে আসছে, চোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা ঝরে পড়ছে। সেই অবস্থায় তিনি পানি ভর্তি পাত্রটি পিতার হাতে এগিয়ে দিলেন আর অঝোরে কেঁদে চললেন। তার মাথা এবং জামার বোতাম খোলা, সে দিকে তাঁর মোটেই খেয়াল নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাকে লক্ষ্য করে মায়াভরা কণ্ঠে ডেকে বললেন ঃ প্রিয়তমা কন্যা! জামার বোতাম আগে লাগিয়ে নাও। তুমি এত বেশী বিচলিত এবং পেরেশান হচ্ছ কি জন্য? আল্লাহর রাস্তায় চলতে গিয়ে তোমার আব্বা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবেন– এ ভয় এ আশঙ্কা তুমি কস্মিনকালে তোমার হৃদয়ে স্থান দিও না।

যতই দিন যেতে লাগল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরামহীন প্রচারের ফলে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে ততই বেড়ে চলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা মহাবীর হামযা (রাঃ) এবং সিংহ-হৃদয় ওমর ইবনু খাত্তাবের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের সাহসিকতা এবং উৎসাহদীপ্ত সহযোগিতার ফলে ইসলামের শক্তি বর্ধিত হয়ে চলল। ফলে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে মুসলমানগণ কাবা গৃহে গমন এবং তথায় প্রকাশ্যে জামা'আতের সঙ্গে শুকরিয়ার নামায আদায় করার তাওফীক লাভ করলেন।

এ সব দেখে কাফিরদের মনে হিংসার আগুন দিগুণ জ্বলে উঠল। তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১১৮ জন মুসলমান দু'বারে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

মুসলমানগণ ইসলামের বাণী সেখানে বহন করে নিয়ে যান এবং ইসলামের নাম, সুখ্যাতি ও শক্তি আরবের বাইরেও প্রসারিত হতে থাকে। ইসলামের এই দুর্বার অগ্রগতিতে মক্কার কাফিরগণ তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠে।

যায়নাবের (রাঃ) মদীনায় হিজরত হলো না

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জন্মভূমি মক্কা মুয়ায্‌যমার মায়া পরিত্যাগ করে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন, তখন পর পর তাঁর তিন কন্যাও মদীনায় গিয়ে তাঁর নৈকট্য ও সাহচর্যে অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মক্কায় মুশরিক স্বামী আবুল 'আসের গৃহে রয়ে যেতে বাধ্য হলেন বড় কন্যা যায়নাব (রাঃ)।

স্নেহময়ী মাতা চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন, অত্যাচার ও যুলম-নির্যাতনের শিকার হয়ে মহান পিতা জন্মভূমি ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তিনশত মাইল দূরে– এক অজানা অচেনা পরিবেশে। স্বামী আবুল 'আস যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তবু ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আতঙ্কিত মক্কাবাসীদের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় অংশ নিতে বাধ্য হন।

মহান পিতা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের বিপুল সমর সম্ভার সহ যুদ্ধ যাত্রায় এবং তাতে স্বীয় স্বামীর অংশ গ্রহণের ফলে স্বামীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর যায়নাব (রাঃ)-এর নারীসুলভ কোমল হৃদয় তখন মানসিক দ্বন্দ্বে ও অস্থিরতায় কিরূপ বিচলিত হয়ে উঠেছিল তা শুধু হৃদয় দিয়েই অনুভব করা যায়।

যায়নাবের স্বামী বন্দী হলেন

হিজরী দ্বিতীয় সালে এবং নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষে– ইসলামের প্রথম এবং সুদূর ফলপ্রসারী ধর্মযুদ্ধ বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয়। এক তৃতীয়াংশেরও কম সংখ্যক যোদ্ধা খুব অল্প সমর-সরঞ্জাম নিয়ে বিপুল অস্ত্র সজ্জিত এক হাজার যোদ্ধার সমবায়ে গঠিত কুরাইশ-বাহিনীকে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের ৩১৩ জন মুজাহিদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন শাহাদাৎ বরণ করেন। অপর পক্ষে অধিকাংশ কুরাইশ নেতা সহ মোট ৭০ জন শত্রু সৈন্য নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়। বন্দীদের অন্যতম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা– যায়নাব (রাঃ)-এর স্বামী আবুল 'আস। বন্দীদের সকলকে মদীনায় আনা হল। তাদের হত্যা করা হবে– না মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে এই বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের (রাঃ) পরামর্শ চাইলেন। আবূ বকর (রাঃ) সহ অধিকাংশ সাহাবা (রাঃ) মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। দয়াল নবী এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। মুক্তি পণ রূপে কেউ দিলেন অর্থ ও কেউ অন্য কিছু। তবে যে সকল বন্দী লেখা পড়া জানত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন যে, তোমরা প্রত্যেকে মদীনার দশ জন বালককে লেখা-পড়া শিখিয়ে দাও– এটাই তোমাদের মুক্তিপণ।

মুক্তি যেভাবে পেলেন

অর্থের বিনিময়ে মুক্তিকামী বন্দীদের অর্থ আসল মক্কা থেকে। বিরহ বেদনা কাতর যায়নাব (রাঃ) স্বামীর মুক্তিপণ স্বরূপ আপন দেবর 'আমর ইবনু রবীকে তাঁর সেই হার ছড়াটি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন– যে হারটি তাঁর মাতা খাদীজা (রাঃ) তাঁর বিয়েতে উপহার স্বরূপ প্রদান করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হারটি দেখেই চিনতে পারলেন এবং চমকিত হলেন। প্রিয়তমা সহধর্মিনী ও সহমর্মিণী খাদীজার (রাঃ) উপহার দেয়া সেই হারটি থেকে কন্যাকে বঞ্চিত করতে তাঁর কোমল প্রাণে আঁচড় কাটল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহাবীদের (রাঃ) অনুমতি ছাড়া তিনি নিজে থেকে কিছুই বললেন না।

সাহাবীদের ডেকে তিনি বললেন, তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে এবং যদি সম্ভব মনে কর, তা হলে এই হারের বিনিময় ছাড়াই তোমরা আবুল 'আসকে মুক্তি প্রদান করতে পার।

ইসলামের জন্য খাদীজার (রাঃ) অতুল্য ত্যাগ এবং অনুপম খিদমতের কথা স্মরণ করে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানসিক অবস্থা দর্শনে এমন কে আছে যে বিরূপ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে? তারা সবাই সানন্দে এবং এক বাক্যে সম্মতি দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু বিনা শর্তে আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেন না। তিনি একটি শর্ত আরোপ করলেন। শর্তটি হচ্ছে এই যে, আবুল 'আস মক্কায় ফিরে গিয়েই যায়নাবকে (রাঃ) মদীনায় পিতার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আবুল 'আস এই শর্ত মেনে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন এবং এসেই যায়নাব (রাঃ)-এর মদীনায় প্রেরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু সহজে এবং সুস্থ দেহে যায়নাব (রাঃ)-এর পক্ষে মদীনায় পিত্রালয়ে পৌঁছা সম্ভব হয়নি।

মদীনায় হিজরতের পথে বাধা

মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার পর মক্কার অদূরে যে অপ্রীতিকর ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে যায়নাব (রাঃ) মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য হন অতঃপর সেই মর্মস্পর্শী ও হৃদয়-বিদারক ঘটনাটি বিবৃত হচ্ছে।

যায়নাব (রাঃ)-কে মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল 'আসের সাথে তাঁর পালিত পুত্র এবং বিশ্বস্ত অনুচর যায়িদ ইবনু হারিসাকে (রাঃ) পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে এই নির্দেশ প্রদান করলেন ঃ "তুমি 'বাত্নি ইয়াজুজ' নামক স্থানে অপেক্ষা করতে থাকবে। যখন যায়নাব (রাঃ) সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাকে তুমি সাথে করে মদীনায় নিয়ে আসবে।" যায়িদ (রাঃ) যথাসময় সেখানে পৌঁছে অধীর আগ্রহে যায়নাব (রাঃ)-এর আগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে চললেন।

এদিকে আবুল 'আস মক্কায় এসে প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেনানার সাথে যায়নাব (রাঃ)-কে 'বাতনি ইয়াজুজ' পর্যন্ত পৌঁছে দেবার নির্দেশ প্রদান করলেন।

যায়নাব গোপনে গোপনে মক্কা ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু তবুও কথা গোপন থাকল না। যায়নাবের (রাঃ) মক্কা ত্যাগের আয়োজনের কথা জানাজানি হয়ে গেল এবং এ নিয়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। কিন্তু কুট বুদ্ধি সম্পন্ন কিছু সংখ্যক লোক যাত্রা পথে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিলো।

যায়নাব (রাঃ) কিছু দিন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। অবশেষে অবস্থা কিছুটা অনুকূল ভেবে আল্লাহর উপর ভরসা করে দেবর কেনানাকে সাথে নিয়ে উটের পিঠে আরোহণ করে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন।

কাফিররা এ সংবাদ যথাসময়ে জানতে পারল। কিছু সংখ্যক লোক

উত্তেজনার বশে প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং যায়নাব (রাঃ)-কে গ্রেফতারের জন্য বেরিয়ে পড়ল। এই দলে ছিল হোব্বার ইবনু আসওয়াদ নামে এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির যুবক। এ ছিল খাদীজা (রাঃ)-এর চাচাত ভাই এর পুত্র এবং সেই সূত্রে যায়নাবের (রাঃ) রক্ত সম্পর্কীয় ভাই। কাফিররা 'যি-তুয়া' নামক স্থানে উটসহ যায়নাব (রাঃ) ও কেনানাকে ঘিরে ফেলল। তারা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে চলল, বর্শা দ্বারাও আঘাত হানল। বর্শার এক আঘাতে যায়নাব (রাঃ)-এর উট মারাত্মক ভাবে আহত হল। কোন কোন বর্ণনায় যায়নাব (রাঃ)-এর পবিত্র দেহও তীর বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল।

সর্বসম্মত মতে যায়নাব (রাঃ) উট থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। এই সময় তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। পতন জনিত প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে গেল। তখন তাঁর অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং হৃদয়বিদারক। এই অবস্থায় কাফিরগণ রক্তরঞ্জিত যায়নাবকে (রাঃ) অধিকতর শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। যায়নাবের দেবর কেনানা এবার জীবনপণ করে প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তার তীরদানী থেকে তীর বের করে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "থামো। এখন যে কেউ এক পদ আমাদের দিকে অগ্রসর হবে তাকেই এই তীরের শিকারে পরিণত হতে হবে।" কেনানার উগ্রমূর্তি দেখে কাফিরগণ হিম্মত হারিয়ে ফেলল, তারা সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। এই সময় কুরাইশ সরদার আবূ সুফিয়ানের তথায় আগমন ঘটল। তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কেনানাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। তুমি তোমার উদ্যত তীরটা সরিয়ে নাও, আমরা তোমার সাথে কিছু কথা বলে নেই।" কেনানা তীর বন্ধ করে বললেন– কি বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলুন। আবূ সুফিয়ান তখন বললেন ঃ "কেনানা! তোমার তো অজানা নেই– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কী নিয়ে আমাদের বিরোধ। তাঁর হাতে আমাদের পরাজয় এবং বিপর্যয় ঘটছে এবং তার ফলে যে অবমাননা আমাদের বরদাশত করতে হয়েছে সে সম্পর্কেও তুমি ওয়াকিফহাল। যদি

মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেয়েকে মদীনায় যেতে দিই তা হলে লোকে ভাববে আমরা বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমাদের মধ্যে নানারূপ কথা উঠবে এবং একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। কাজেই তুমি এখন যায়নাব (রাঃ)-কে নিয়ে মক্কায় ফিরে চল। উত্তেজনা কমে গেলে এবং অবস্থা কিছুটা শান্ত হলে তাঁকে সুযোগমত নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।"

কেনানা আবূ সুফিয়ানের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং যায়নাব (রাঃ)-এর আঘাতজনিত অবস্থা ও পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা করে আপাতত মক্কায় ফিরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন।

আহত ও অসুস্থ যায়নাব (রাঃ) মক্কায় ফিরে গেলেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন। অতঃপর অবস্থা বুঝে কেনানা তার ভ্রাতৃবধু যায়নাব (রাঃ)-কে নিয়ে পুনরায় মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। 'বাত্নি ইয়াজুজ' উপত্যকায় পৌঁছে তথায় অপেক্ষারত যায়েদ ইবনু হারিসার (রাঃ) হাতে যায়নাব (রাঃ)-কে সোপর্দ করে তিনি মক্কায় ফিরে এলেন।

যায়িদ (রাঃ) নবী-নন্দিনী যায়নাব (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে যথা সময় মদীনায় পৌঁছলেন এবং সসম্মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে তাঁর আদরের দুলালীকে অর্পণ করলেন।

স্নেহময়ী কন্যার নিকট তাঁর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা শুনে দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। নবী সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দুর্ঘটনার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলে উঠেন ঃ "আফসোস! আমার কন্যা যায়নাব আমার সব কন্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– আর তাকেই শুধু আমার প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে কাফিরদের হাতে এরূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল।"

স্বামীর মক্কায় একাকী জীবন

যায়নাব (রাঃ) মদীনায় পিত্রালয়ে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর স্বামী আবুল 'আস মক্কায় অবস্থান করে ব্যবসা বাণিজ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও সফল ব্যবসায়ী, অত্যন্ত কর্মঠ ও আমানতদার এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। ব্যবসার দ্রব্য নিয়ে তিনি সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করতেন। উল্লেখিত গুণের জন্যই অনেকে আবুল 'আসের মাধ্যমে তাদের পণ্য দ্রব্যাদি দেশ-বিদেশে কেনা বেচা করাত।

আবুল 'আস একাকী জীবন যাপন করে চললেন। মাঝে মাঝেই তাঁর সুন্দরী গুণবতী প্রিয়তমা স্ত্রী যায়নাব (রাঃ)-এর কথা মনে পড়ত। তাঁর বিরহ বেদনা তাকে বিষণ্ন ও ব্যথিত করে তুলত, আর কবিতার আকারে তার বেদনা-ক্লিষ্ট মনের সেই আহাজারির অভিব্যক্তি ঘটত। এমন একটি কবিতার দুটি পঙ্কতি তাবাকাতের বরাতে বর্ণিত হয়েছে যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে ঃ

"আমি যখন 'এরাম' নামক স্থানটি অতিক্রম করছিলাম, তখন যায়নাব (রাঃ) আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল আর তখনই আমার মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দু'আ উচ্চারিত হল ঃ হে আল্লাহ তুমি রোগমুক্ত ও সুস্থ রাখো তাকে (আমার প্রিয়তমা নারীকে) যে অবস্থান করছে (মদীনার) হরমে। আল-আমীন (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যাটিকে তাঁর কল্যাণ কাজের জন্য পুরস্কৃত করুন, প্রত্যেক স্বামী প্রশংসা করে থাকে তাকে (তার গুণবতী স্ত্রীকে) যাকে সে উত্তম জানে।"

দিন বয়ে চলল এবং এক এক করে চার চারটি বৎসর অতিক্রান্ত হল। ইসলামের শক্তি বেড়ে চলল কিন্তু আবুল 'আস তখন পর্যন্ত ইসলাম কবূল করলেন না। কারণ একটিই ঃ আল্লাহর হুকুম তখন পর্যন্ত হয়নি।

যায়নাব স্বামীকে আশ্রয় দিলেন

৬ষ্ঠ হিজরীতে সেই প্রত্যাশিত হুকুম এল, তিনি ইসলাম কবুল করলেন। কি ভাবে– সে কথাই নিম্নে বিবৃত হচ্ছে।

আবুল 'আস তার সঙ্গী-সাথী সহ বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়ায় গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত ১৭০ জনের একটি মুজাহিদ বাহিনীর সাথে তাদের মুকাবিলা হল। ছোটখাটো যুদ্ধের পর কাফিরগণ পরাজিত হয়ে বন্দী হল। তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের যে মালপত্র ছিল সবই মুসলমানদের হস্তগত হল। আবুল 'আস কিন্তু কৌশলে বন্দী দশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে সোজা মদীনায় চলে আসলেন এবং এসেই তাঁর প্রাক্তন জীবন-সঙ্গিনী নবী-দুলালী যায়নাব (রাঃ)-এর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

একদিকে ভূতপূর্ব স্ত্রীর নিকট আশ্রয় লাভের জন্য আবুল 'আস-এর করুণ মিনতি, অপর দিকে প্রাণ-প্রিয় পূর্ব স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যায়নাব (রাঃ)-এর আকুল হৃদয়-কামনা; সহানুভূতি ও প্রেমের স্মৃতি এই দুই দাবী উপেক্ষা করা যায়নাব (রাঃ)-এর মত খোলামন ও প্রেমময়ী নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি আবুল 'আসকে আশ্রয় দিলেন। প্রত্যুষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায পড়ছিলেন তখন (কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, নামায থেকে ফারিগ হয়েছেন এমন সময়) যায়নাব (রাঃ) সাহস সঞ্চয় করে সুমধুর মৃদু আওয়াযে ঘোষণা করলেন ঃ

"ইন্নী ক্বাদ আজারতু আবাল 'আস।"

"আমি আবুল 'আসকে আশ্রয় প্রদান করেছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যার সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত এই ছোট্ট ঘোষণা শুনলেন। তিনি নামায শেষ করেই সাহাবাদের (রাঃ) লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"হে লোকসকল! তোমরা কি কিছু শুনতে পেয়েছ? তারা সমস্বরে বললেন ঃ জি হ্যাঁ, আমরা শুনতে পেয়েছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন,

কসম সেই আল্লাহর যার হাতে আমার জীবন। গায়িবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট, অন্য কেউ এর অধিকারী নয়, আমিও নই। সত্যই যায়নাবের (রাঃ) এই ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমিও জানতাম না যে, আবুল 'আস যায়নাবের (রাঃ) আশ্রয়ে আছে।

তারপর তিনি বললেন ঃ যদি সাধারণ একজন মুসলমানও কাউকে আশ্রয় দেয়, তা হলে সমস্ত মুসলমানের (তথা সরকারের) উচিত তা রক্ষা করা।

এরপর তিনি যায়নাব (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ বেটী! আবুল 'আসের প্রতি যথারীতি লক্ষ্য রাখবে, তার যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়, তার আদর যত্নের যেন কোন ত্রুটি না ঘটে, তবে তুমি তার থেকে অবশ্য নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে।

আবুল 'আসের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সহৃদয় ও নমনীয় মনোভাব দর্শনে যায়নাব (রাঃ) উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং আবুল 'আসের জন্য একটি বড় রকম সুপারিশ জানালেন।

যায়নাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবুল 'আসের আটককৃত মালামালসহ তাকে মুক্ত করে দেয়ার অনুরোধ জানালেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হে আমার স্নেহময়ী কন্যা! এ ব্যাপারটি আমার একার ফায়সালার বিষয় নয়, এটা সমগ্র মুসলিম জামা'আতের এখতিয়ারভুক্ত। তারা যদি রাযী হয় উত্তম, না হলে আমার করার কিছু নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে (রাঃ) ডেকে বললেন ঃ দেখ! আমার এবং আবুল 'আসের মধ্যে যে সম্পর্ক তা তোমরা সবাই জান, এবারও যদি তোমরা আবুল 'আসকে তার মালামালসহ– যা তোমরা গনীমাতরূপে পেয়েছ, মুক্তি প্রদান কর তবে তা আমার পক্ষে হবে খুবই খুশীর কারণ। তা ছাড়া এর জন্য তোমাদের প্রতি সে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে (যার ফল হবে অত্যন্ত শুভ)। তবে এ ব্যাপারে আমি তোমাদের বাধ্য করছি না। তোমরা নিজেরা বিবেচনা করে দেখ।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছা এবং তাঁর খুশীর কারণ পূরণ না করে তাঁর বিরোধিতা করবেন– এমনটি হতেই পারে না। তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। সুতরাং তারা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন এবং গনীমাতের মালগুলো এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে হাজির করলেন।

আবুল 'আস মুক্তি পেলেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর ব্যবসার সমস্ত দ্রব্য সম্ভারও পেলেন। ফের তাঁর প্রতি যায়নাব (রাঃ)-এর আকর্ষণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তার জন্য সুপারিশ আর তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ও দয়ার্দ্র আচরণ তাঁকে অভিভূত করে তুলল। এর ভিতর দিয়ে ইসলামের মহান নীতি ও উদার আদর্শ তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠলো। তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কিন্তু একটি বিশেষ বিবেচনায় তিনি তখন ইসলামে দীক্ষিত হলেন না। সেটা কী তা একটু পরেই জানা যাবে। অবশেষে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আবুল 'আস তার মালপত্র নিয়ে নিরাপদে মক্কায় ফিরে এলেন। তাঁর নিকট মক্কার কুরাইশদের অনেকের অনেক টাকা পয়সা ও দ্রব্যাদি গচ্ছিত ছিল। তিনি মক্কায় ফিরে এসেই প্রত্যেককে যার যার গচ্ছিত টাকা কড়ি ও দ্রব্যাদি বুঝিয়ে দিলেন। তারপর কুরাইশদের একত্রে ডেকে তাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ এখন আমার নিকট তোমাদের কারও কোন দেনা পাওনা নেই তো? সকলেই বললেন– না, কারও কোন কিছুই পাওনা নেই। তুমি প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছ। তুমি একজন দায়িত্বসম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

আবুল 'আস তখন বললেন ঃ তোমরা এখন শুন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনঃ আমি এখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছি। এই কথা বলেই তিনি সকলের সম্মুখে সুউচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ঃ

"আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।"

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত পক্ষে অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনই শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাস এবং রাসূল।

কাফিররা তার ইসলাম গ্রহণের কথা এবং ঘোষণা শুনে হতভম্ভ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। তিনি তাঁদের লক্ষ্য করে আরও বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে তাঁর কন্যার আশ্রয়ে যখন অবস্থান করছিলাম তখনই ইসলাম কবূল করতাম। করিনি শুধু একটি কারণে আর তা হচ্ছে এই যে, তোমরা হয়ত ভাবতে যে, তোমাদের গচ্ছিত অর্থ ও দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই আমি ইসলাম কবূল করেছি। এ ভ্রান্ত ধারণা যাতে আদৌ সৃষ্টি না হতে পারে, সেজন্যই আমি তোমাদের গচ্ছিত সব কিছু প্রত্যার্পণ করে তারপর ইসলাম কবূল করলাম।

সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসের ঘটনা এটি। এর পরপরই আবুল 'আস মক্কা-মুয়ায্যমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আবুল 'আস মদীনায় পৌঁছে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা বিবৃত করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতুহলের সাথে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবুল 'আস! তুমি যখন বন্দী অবস্থায় এখানে অবস্থান করছিলে এবং যখন তোমাকে তোমার মালসহ মুক্ত করে দেয়া হল তখন তুমি কেন ইসলাম কবূল করলে না?

আবুল 'আস আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মনে মনে তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু মুখে কালিমায়ি শাহাদাত শুধু এ জন্যই উচ্চারণ করিনি যে, লোকে এই বলে অভিযোগ দিবে যে, ভয়ে ভীত হয়ে এবং মাল ফেরত পাওয়ার লোভে আমি ইসলাম কবূল করেছি।

আবুল 'আসের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদে মদীনার মুসলমানদের মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

যায়নাবের শিশু সন্তানের ইন্তিকাল

আবুল 'আস ইসলাম কবুল করার পর যায়নাব (রাঃ)-এর সাথে তার পুনর্মিলনের বাধা অপসারিত হল। দীর্ঘ ছয় বৎসরের বিচ্ছেদ বেদনা এবং দুঃসহ বিরহ যাতনা ভোগের পর স্বামী-স্ত্রীর একান্ত বাঞ্ছিত মিলন ঘটল।

মনে হয় আবুল 'আস ও যায়নাব (রাঃ) দম্পতির জন্য নিকটেই কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার সানন্দে তাঁর প্রিয়তমা কন্যা যায়নাব (রাঃ)-কে অনুমতি দান করলেন। স্বামী-স্ত্রী নতুন করে সুখের নীড় রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সে নীড় রচিত হল এবং দুই অথবা তিনটি সন্তান সহ তাঁরা সেই সুখের সংসারে সন্তোষ-ধন্য জীবন যাপন শুরু করলেন।

কিন্তু খুব বেশী দিন এ সুখ স্থায়ী হতে পারল না। প্রথমে তাদের একটি সন্তান আল্লাহর আহ্বানে এ অস্থায়ী জগত থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করল।

সহীহ বুখারীতে উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেন–

আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে বসে আছি এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক কন্যার খাদিম এসে খবর দিলো যে, তার মনিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ডেকে পাঠিয়েছেন। কেননা তার সন্তান মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন, যাও গিয়ে কন্যাকে বলো ঃ ইন্না লিল্লাহি মা আখাযা ওয়া লাহু মা আ'তা ওয়া কুল্লু শায়য়িন ইন্দাহু বিআজালিম মুসাম্মা।

"আল্লাহ যা ফিরিয়ে নেন তা অবশ্যই তাঁর এবং যা তিনি প্রদান করেন তাও তাঁরই, আর প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত হয়ে আছে তাঁর নিকট।"

"কন্যাকে একথাও বলে দিও ঃ সে যেন সবর করে এবং ধৈর্য ধারণ করে চলে।"

খাদিম চলে যায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে। এসে বলে ঃ তিনি আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাশরীফ নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন না গিয়ে পারলেন না। তাঁর সাথে গমন করেন সা'দ ইবনু উবাদা (রাঃ) এবং মা'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সেই শিশুটিকে দেখান হল, তখন তার শেষ অবস্থা। নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, নাড়ির গতি থেমে যাচ্ছে, ঢেকুর বেড়ে চলেছে.........।

আল্লামা কাজী সুলাইমান মনসুরপুরী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'রাহমাতুললিল আলামীন' দ্বিতীয় খণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠায় এই হাদীসের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, খুব সম্ভব এই শিশুটি ছিল আলী (সাবতির রাসূল) ইবনু আবিল 'আস।

কিন্তু পরবর্তী পর্যালোচনায় জানা যাবে যায়নাব (রাঃ)-এর প্রথম পুত্র আলীর মৃত্যু আরও পরের ঘটনা।

উপরোক্ত ঘটনাটি আরও একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা নিম্নে তার অনুবাদ পেশ করছি ঃ

যায়নাবের একটি শিশু সন্তান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বল্পায়ু করেছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অবস্থা যখন সংগীন হয়ে উঠল এবং মৃত্যুর আশঙ্কা নিশ্চিতরূপে দেখা দিল, তখন যায়নাব (রাঃ) তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সংবাদ দিয়ে তাঁর আদুরে নাতীকে দেখে যাওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন শিশুর অন্তিম মুহূর্ত অতি নিকটে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র হৃদয় এবং করুণাপ্রবণ। শিশুদের অস্থিরতা, অস্বস্তি এবং কষ্ট যাতনা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে পড়তেন।

এ জন্যই প্রথমে তিনি তথায় যেতে ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু স্নেহের মেয়ে পুনরায় যখন আল্লাহর কসম দিয়ে ডেকে পাঠালেন তখন তিনি আর সে ডাক উপেক্ষা করতে পারলেন না। দৌহিত্রকে তিনি দেখতে গেলেন। যায়নাব মুমূর্ষু শিশুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে দিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রুগ্ন শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়েছেন তখন শিশুটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী চেহারার প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু-পূর্ব হেচকী শুরু হয়ে গেল। কোলের উপর এবং চোখের সামনে এই বিদায় দৃশ্য অবলোকন করে তাঁর কোমল হৃদয় বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা ঝড়ে পড়তে লাগল। একজন সাহাবা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কী আশ্চর্য, আপনিও কাঁদছেন?

জওয়াবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার প্রিয় কন্যার প্রিয় সন্তান, তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত হৃদয়ের শোকাবেগে চক্ষু দিয়ে অশ্রু-ধারা নির্গত হওয়া কোন দোষের কথা নয়। (অবশ্য চিৎকার করে কান্না কাটি করা দূষণীয়)

যায়নাব (রাঃ)-এর ইন্তিকাল

'আবুল 'আস-এর সাথে পুনর্মিলনের মাত্র বৎসরাধিক কাল পর ৮ম হিজরীর কোন এক সময় স্বয়ং যায়নাব (রাঃ) ইহজগত থেকে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় মক্কার এক কাফিরের বর্শা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উটের পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর যে গর্ভপাত ঘটে যায় সেই আঘাত এবং গর্ভপাত জনিত রক্তক্ষরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। পুনঃ পুনঃ রোগের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, অবশেষে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে ও রোগ তীব্রতর হয়ে উঠে এবং তিনি আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর অনন্ত সান্নিধ্যে প্রস্থান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

এর চার বৎসর পর ১২ হিজরীর যিল-হজ্ব মাসে আবুল 'আসও (রাঃ) পরলোক গমন করেন।

গোসল ও কাফন দান

উম্মু আইমান, সাওদা, উম্মু সালামা এবং উম্মু আতিলাঃ যায়নাবের (রাঃ) গোসল দানে শরীক হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মত তারা গোসল প্রদান করেন।

উম্মু আতিয়া বলেন, আমি নিজে যায়নাব (রাঃ) বিনতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোসল দানে অংশ নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং গোসলের তরীকা বর্ণনা করছিলেন, আর আমরা তা হুবহু পালন করছিলাম। তিনি বলেছিলেন প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিন বার অথবা পাঁচ পাঁচ বার করে ধুয়ে দেবে।

এর তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিষ্কার ভাবে ধৌত এবং

ময়লামুক্ত হওয়া চাই। তিন বারেই যদি তা সম্পন্ন হয় তবে তাই যথেষ্ট নতুবা পাঁচ বার ধৌত করবে যেন সমস্ত শরীর সন্দেহাতীত ভাবে নির্মল ও পবিত্র হয়ে যায়।

মৃত দেহের গোসল শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মত তাকে কাফনের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু আর্থিক অসংগতির কারণে কাফনের কাপড় প্রয়োজন মত যোগাড় না হওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা পূরণের জন্য স্বীয় ব্যবহারের লুঙ্গী কাফনের জন্য প্রদান করলেন। তাঁর নির্দেশ মত মাথায় তিনটি বেনী পাকান হল এবং সুগন্ধী (কাফুর) দ্রব্য ব্যবহার করা হল।

মাতৃহারা সন্তানদের অবস্থা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা

যায়নাব (রাঃ) মৃত্যুকালে তাঁর দু'টি সন্তান রেখে যান। একটি পুত্র, অপরটি কন্যা। পুত্রের নাম আলী, কন্যার নাম উমামাহ। তার জীবদ্দশায় তার একটি সন্তানের অল্পবয়সে মৃত্যুর কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

আলী হিজরতের পূর্বে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। কখন এবং কার সাথে কি ভাকে তার মদীনায় আগমন ঘটে তার কোন বিবরণ জানা যায় না। তবে এটা জানা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনি সুন্দরতম শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা ও সৎ-চরিত্র লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সর্বদা সাথে রাখতেন। যদি জিহাদ অভিযানে বাইরে যেতেন তখনও অনেক সময় তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। মক্কা অভিযান কালেও আলী তাঁর নানার সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কিশোর আলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একই উটে সওয়ার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাতৃ-হারা এ কিশোর দৌহিত্রকে কিরূপ ভালবাসতেন উক্ত ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান ও অনুভব করা যায়।

এক মতে 'আলী ইবনু 'আবিল 'আস তাঁর পিতার জীবদ্দশায় যৌবন প্রাপ্তির পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। কিন্তু অন্য মতে আবূ বাক্বার (রাযিঃ)-এর খিলাফাতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাৎ বরণ করেন।

যায়নাব (রাযিঃ)-এর কন্যা উমামাহ্ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহলাভে ধন্য হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় কন্যার রেখে যাওয়া একমাত্র কন্যা উমামাহ্কে কিরূপ ভালবাসতেন তার একাধিক বিবরণ হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে দেখতে পাওয়া যায়।

সহীহ বুখারীর কিতাবুস্ সালাতে আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ তদীয় কন্যা যায়নাব (রাযিঃ) এবং (জামাতা) 'আবুল 'আস ইবনু রাবী ইবনু 'আব্দিশ শামস-এর শিশু কন্যা উমামাহ্ (রাযিঃ)-কে (স্বীয় গরদানে) বহন করে নামায পড়তেন। যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন তাঁকে (মাটিতে) বসিয়ে দিতেন এবং যখন সিজদাহ্ হতে উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকে পুনঃ (ঘাড়ে) তুলে নিতেন।"

–বুখারী [তাওহীদ পাবলিকেশন্স, হাঃ ৫১৬], [আধুনিক প্রকাশনী, হাঃ ৪৮৬]

মুসনাদে আহ্মাদে রয়েছে একবার কোন এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর খিদমাতে কিছু তোহ্ফা প্রেরণ করেন। সে তোহ্ফার মধ্যে ছিল একটি সোনার হার। হারখানা হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সকলের সামনে ঘোষণা করলেন, আমি এ হারটি তাকেই দেব যে আমার নিকট সব চেয়ে অধিক প্রিয়। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ তখন বুঝে নিলেন যে, ঐ হার আয়িশাহ্ (রাযিঃ) ছাড়া আর কারো ভাগ্যেই জুটবে না। কিন্তু দেখা গেল তাদের ধারণা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমামাহ্ (রাযিঃ)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর গলায় সে হারটি পরিয়ে দিলেন।

এমনি ভাবে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশিও যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু তোহফা পাঠালেন তখন তার মধ্যে প্রাপ্ত সোনার আংটিটি তিনি উমামাহর (রাঃ) হাতে দিয়ে বললেন ঃ এই আংটিটা তুমি পরে নাও।

তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে উমামাহই (রাঃ) আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

একাদশ হিজরীতে উমামাহ (রাঃ) বয়ঃপ্রাপ্তা হন। ইতিপূর্বেই তাঁর পিতা আবুল 'আসের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু কালে আবুল 'আস (রাঃ) যুবাইর ইবনু আওয়ামকে (রাঃ) এই ওয়াসীয়াত করে যান যে, তিনি যেন তার কন্যা উমামাহকে (রাঃ) কোন সৎ পাত্রের হাতে অর্পণ করেন।

অপরদিকে ফাতিমাতুয যোহরা (রাঃ) তাঁর অন্তিম কালে আলীকে (রাঃ) ওয়াসীয়াত করে যান, তাঁর মৃত্যুর পর যদি কাউকে বিবাহ করতে হয়, তাহলে তিনি যেন তাঁর ভগ্নী-কন্যা উমামাহকে (রাঃ) স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।

আলী (রাঃ) ফাতিমার (রাঃ) ওয়াসীয়াত মুতাবিক উমামাহকে (রাঃ) স্ত্রীরূপে বরণ করতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। যুবাইর (রাঃ) দেখলেন আলীর (রাঃ) চাইতে সৎ পাত্র আর কে হতে পারে? তিনিও সন্তুষ্টির সাথে আলীর (রাঃ) হাতে উমামাহকে (রাঃ) অর্পণ করে তাঁর প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করলেন।

আলীর (রাঃ) ঔরসে উমামাহর (রাঃ) কোন সন্তান জন্মের কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

আলীর (রাঃ) শাহাদাতের পর তাঁর ওয়াসীয়াত মুতাবেক উমামাহ বিশিষ্ট সাহাবী মুগীরা ইবনু নওফালকে (রাঃ) স্বামীরূপে বরণ করেন। মুগীরার (রাঃ) ঔরসে উমামাহ (রাঃ)-এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাঁর নাম রাখা হয় ইয়াহইয়া। ইয়াহইয়া শৈশবেই ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

নবী নন্দিনী যায়নাব (রাঃ)-এর জীবনী সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। যতটা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি মোটামুটি তা পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে পরিবেশন করেছি। উক্ত বিবরণীতে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা সম্ভব হয়নি। তবে যতটা তথ্য পাওয়া গেছে এবং পরিবেশিত হয়েছে তা থেকে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং আদর্শ রমণীর পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

নারী জীবনের তিনটি রূপ কন্যা, স্ত্রী-গৃহিণী এবং মাতা যায়নাব (রাঃ) ছিলেন সুন্দরতম চরিত্র ও মহত্তম আচরণের প্রতীক, মানুষের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আদর্শা রমণী খাদীজাতুল কুবরার (রাঃ) প্রথমা কন্যা এবং হয়ত বা প্রথম সন্তান।

দশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কৈশোরের সূচনায় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে যায়নাব (রাঃ) খালাতো ভাই আবুল 'আসের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। কন্যা রূপে তাঁর ইসলাম কবূল করার আহ্বানে ত্বড়িত সাড়া প্রদান এবং তা এমন অবস্থায় যখন প্রিয়তম ব্যক্তি– আপন স্বামী তা গ্রহণ করতে নারায।

চির সত্যবাদী মহান পিতার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ছাড়াও তাঁর ইসলাম গ্রহণের মধ্যে আমরা তাঁর চরিত্রের যে দিকটি দেখতে পাই তা হচ্ছে ঃ সত্যকে সহজে চেনার ক্ষমতা এবং যা সত্য তা প্রতিকূল পরিবেশেও বরণ করে নেয়ার অতুল্য সাহসিকতা।

আমরা দেখতে পাই কিশোরী কন্যা যায়নাব (রাঃ) বিবাহিতা হয়েও এবং শ্বশুর গৃহে কাফির পরিবারে অবস্থান করেও পিতার উপর কাফিরদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনে ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন, মহান পিতার প্রতি নির্মম অত্যাচারের চিহ্ন দর্শনে অঝোরে কেঁদেছেন এবং প্রয়োজনীয় সেবা শুশ্রূষা করেছেন। আরও দেখতে পাই তিনি 'শিআবি আবি তালিবে' পিতা এবং অন্যান্য আপন জনের সাথে দীর্ঘ

অন্তরীণ জীবনের অন্তহীন ও দুঃসহ কষ্ট যাতনা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন।

রিসালাতের মহান দায়িত্ব কর্তব্য পালনে নিয়োজিত নির্যাতিত পিতার প্রতি– বিরুদ্ধ পরিবেশে অবস্থানরত কন্যার কর্তব্য পালন এবং তাঁর সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুন্দরতম আদর্শ আমরা যায়নাবের (রাঃ) মাঝে এই সব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখতে পাই।

ইসলামের বিজয়ের প্রতি আগ্রহ-প্রবণতা, মহান পিতার সহিত মিলিত হওয়ার ব্যগ্র-ব্যাকুলতা, বিরুদ্ধ পরিবেশে অবস্থানের অস্থিরতা এবং স্বীয় পিতা ও উদীয়মান মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় সমরে স্বামীর অংশ গ্রহণে এবং উহার ফলাফল শ্রবণে একদিকে আনন্দ অপর দিকে স্বামীর জন্য উদ্বিগ্নতা, পরবর্তী পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন স্বামীর সাথে মিলনের জন্য হৃদয়ের আকুলতা প্রভৃতি বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হন যায়নাব (রাঃ) একের পর এক।

এই সব ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত যায়নাব (রাঃ) তাঁর সত্যপ্রীতি ও পিতৃ-অনুরাগের জন্য কাফিরদের নিষ্করুণ হস্তে সাংঘাতিকভাবে আহত এবং রক্তরঞ্জিত হন। ধৈর্য ও তিতিক্ষার অতুলনীয় নিদর্শনও আমরা তার মধ্যে লক্ষ্য করি এই সব পর্যায়ক্রমিক ঘটনাবলীর মধ্যে।

এখানেই তার পরীক্ষার শেষ নয়– তাঁর এক শিশু সন্তানকে আল্লাহ তুলে নিয়ে তাঁর সবর এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর তাওয়াক্কুলের চরম পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিনি তাতেও উত্তীর্ণ হন।

কন্যার দুঃখে ও বেদনায় মহান পিতার উৎকণ্ঠা, কন্যার হৃদয়-প্রবণতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সহৃদয়তা এবং তাঁর সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে কন্যার প্রতি পিতার কর্তব্য পালনের মহান আদর্শের আমরা সুন্দরতম নিদর্শনই দেখতে পাই মহা মানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণ ও সুব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে যার আলোচনা আমরা উপরে করে এসেছি।

স্ত্রীরূপে যায়নাব (রাঃ)

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু সেটা মোটেই দাম্পত্য সম্পর্কের মুখ্য কথা নয়। পারস্পরিক ভালবাসা, প্রেম ও প্রীতির সম্পর্কই হচ্ছে উক্ত বন্ধনের সফলতা এবং সার্থকতার মূল সূত্র। অকৃত্রিম প্রেম ও নিবিড় ভালবাসা আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর অপরিহার্য গুণ এবং অমূল্য ভূষণ।

যায়নাব (রাঃ) ও আবুল 'আস (রাঃ)– উভয়ের মধ্যে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বাঞ্ছিত গুণের চমৎকার সমাবেশ দেখতে পাই।

বিভিন্ন ঘটনা ও আচরণে আমরা উভয়ের পারস্পরিক ভালবাসার গভীরতার পরিচয় লাভ করি। ধর্মে পৃথক পথ অবলম্বন এবং মুসলিম-কাফিরদের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও দুজনের কেউই তাদের দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করতে প্রস্তুত নন বরং বন্ধন অটুট রাখতেই একান্ত অভিলাষী।

কুরাইশদের কতক লোক আবুল 'আসের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল যায়নাব (রাঃ)-কে তালাক দেয়ার জন্য। এমন কি তাঁর পরিবর্তে আবুল 'আসের পছন্দ মত কুরাইশদের যে কোন সুন্দরী মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও তারা প্রদান করে। কিন্তু আবুল 'আস তাদের সে প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে যায়নাবের প্রতি তার অটুট প্রেম ও গভীরতম ভালবাসার নির্ভুল প্রমাণ প্রদান করেন।

বদর যুদ্ধে পরাজিত কাফিরদের মধ্যে যারা বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হয়, তাদের মধ্যে আবুল 'আসও ছিল অন্যতম। তার মুক্তিপণ রূপে যায়নাব (রাঃ) কর্তৃক তাঁর মাতৃপ্রদত্ত সোনার হার প্রেরণের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর স্বামী-অনুরাগের অতল গভীরতা এবং অত্যুজ্জ্বল ত্যাগের পরিচয় পাই।

পরবর্তী পর্যায়ে মদীনায় পিতৃগৃহে অবস্থান কালে পুনরায় বন্দী আবুল 'আসকে আশ্রয় প্রদান এবং দখলকৃত মালামাল সহ তাকে মুক্ত করে দেয়ার

জন্য পিতার নিকট নির্ভর সুপারিশের মধ্যেও আমরা আবার আবুল 'আসের প্রতি যায়নাব (রাযিঃ)-এর অকৃত্রিম ভালবাসা ও অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ দেখতে পাই যার শুভ পরিণতি ঘটে তাঁদের আকাঙ্খিত পুনর্মিলনে।

মাতারূপে যায়নাব (রাযিঃ)

পুত্র ও কন্যার প্রতি স্নেহানুরাগ, আন্তরিক মায়া এবং রোগ বিরোগে উদ্বেগ ও শোকাকুলতা মাতৃ হৃদয়ের এক স্বাভাবিক ব্যাপার ও সহজাত বৃত্তি। এ বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল যায়নাব (রাযিঃ)-এর মধ্যেও। তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা উপরে পেয়েছি। তথ্যের অভাবে পূর্ণ পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত।

ইস্‌লাম-প্রীতি, রাসূলপ্রীতি এবং পিতৃ অনুরাগের জন্যই তিনি কাফিরদের হাতে আঘাত প্রাপ্ত হন– সে আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই তাঁকে যুবতীকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। যুবতী বয়সে একটি বিকাশোম্মুখ ফুল ঝরে পড়ায় আমরা তাঁর পূর্ণ সুবাস থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁর জীবনী থেকে যতটুকু শিক্ষনীয় তাও নেহায়েত কম নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে, বিশেষ করে আমাদের মা ও বোনদেরকে তাঁর মহৎ জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রেরণা লাভের তাওফীক্ব প্রদান করুন –আমীন ॥

[যায়নাব (রাযিঃ)-এর জীবনী সমাপ্ত]

রুকাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

রুকাইয়া (রাঃ)-এর পরিচয় বিবাহ ও তালাক

রুকাইয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয়া কন্যা। নবুওয়াত লাভের ৭ বৎসর পূর্বে খাদীজাতুল কুবরার (রাঃ) গর্ভে রুকাইয়া (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স তখন ৩৩ বৎসর।

রুকাইয়া (রাঃ)-এর শৈশব কাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই রুকাইয়া এবং তাঁর ছোট বোন উম্মু কুলসূমের শুভ বিবাহ তাঁর অন্যতম চাচা আবূ লাহাবের দুই পুত্র যথাক্রমে উৎবা ও উতাইবার সাথে সম্পন্ন করেন। বয়সে খুব ছোট ছিলেন বলে তাদের স্বামীগৃহে প্রেরণ করা হয়নি।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করলেন। আল্লাহর নির্দেশ মত তিনি প্রথমে গোপনে এবং তিন বৎসর পরে প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি স্বজনবর্গ ও লোকদিগকে আহ্বান জানাতে থাকলেন। তাঁর এই আহ্বান ও প্রচার কার্যের ফলে দু'একজন করে পিতৃধর্ম প্রতিমা পূজা ছেড়ে আল্লাহর সিরাতে মুস্তাকীম– সোজা সরল পথ অবলম্বন করলেন। সর্বপ্রথম বিবি খাদীজা (রাঃ) এবং তার পর পরই তাঁর কন্যাগণও ইসলাম কবূল করে ধন্য হলেন।

এতে মক্কার কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নবদীক্ষিত মুসলমানগণকে নানাভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা এবং অমানুষিক কষ্ট দিতে লাগল। এই দুশমনদের মধ্যে তাঁর চাচা আবূ লাহাব এবং চাচী উম্মু জামীলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আবূ লাহাবের

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দৈহিক যাতনা এবং রূঢ় ব্যবহারে মনঃকষ্ট প্রদানের বহু বিবরণ বিশ্বস্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে তার স্ত্রী উম্মু জামীলা ছিল তার সহকর্মিণী বরং এক ধাপ অগ্রবর্তিণী। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দেওয়ার মানসেই বনে জঙ্গলে গিয়ে কাঁটাধারী বৃক্ষ থেকে কাঁটাওয়ালা শাখা কেটে আনত এবং রাত্রির আঁধারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাতায়াত পথে সেই কাঁটা বিছিয়ে রাখত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রত্যুষে সেই পথ দিয়ে হাঁটতেন তখন কাঁটার আঘাতে তার পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইসলামের চিরশত্রু এই দম্পতি-যুগলের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার-নির্যাতন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করলেন–যাতে বলা হয়েছে ঃ

"বিনষ্ট হোক আবূ লাহাবের বাহু যুগল এবং বিনষ্ট হোক সে নিজেও। তার ধন-দৌলত এবং তার কামাই রোজগার কোনই উপকারে আসল না তার। অনতিবিলম্বে সে প্রবেশ করবে দাউ দাউ করা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে এবং তার সাথে তাঁর (চুগলখোর) স্ত্রীও, যে বন থেকে কাষ্ঠ বহন করে আনত। তার গ্রীবাদেশে আঁকড়ে থাকবে খেজুর (গাছের) দৃঢ় রজ্জু।"

এই সূরা নাযিল হওয়ার সংবাদ পেয়ে আবূ লাহাব এবং তার হিংসুটে বিবি উম্মু জামীলা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। আবূ লাহাব দাঁত কড়মড় করতে করতে তার দুই পুত্রকে ডেকে বললো ঃ "এই মুহূর্তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ীতে গিয়ে তোরা দু'জন তার দুই কন্যাকে তালাক দিয়ে আয়, আমি আমার বাড়ীতে দুশমনের মেয়েদের বরদাশত করতে পারব না।"

উম্মু জামীলা রাগে অন্ধ হয়ে উৎবা এবং উতায়বাকে লক্ষ্য করে বলল– "দেখ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোদের পিতা-মাতা সম্বন্ধে কী ভয়ানক কথা উচ্চারণ করেছে। এর পরও কি তারই দুই মেয়েকে আমাদের পুত্রবধু রূপে ঘরে আনা চলে? তোরা এক্ষুণি গিয়ে তাদের তালাক দিয়ে আয়। যদি না দিস, তোদের সাথে আমাদের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন। তোদের সাথে আমাদের কথা বলা, উঠা-বসা, একত্রে বাস করা হারাম।

উৎবা এবং উতাইবা পিতা-মাতার আদেশ শিরোধার্য করে নিল। পর পর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। পিতা-মাতার মুখের উপর প্রথমে উৎবা দম্ভের সাথে উচ্চারণ করল ঃ "আমি রুকাইয়া (রাঃ)-কে তালাক দিলাম।" উতাইবাও পরক্ষণে বলে গেল ঃ "আমি উম্মু কুলসূম (রাঃ)-কে তালাক দিলাম।"

স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাদীজা (রাঃ) জামাতাদের এই নিষ্ঠুর আচরণে ব্যথিত হলেন। স্বাভাবিক অনুমানেই বলা চলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত এই অবস্থাকে আল্লাহর মঙ্গল ইচ্ছার বাস্তবায়নরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিজে ধৈর্য ধরে খাদীজা (রাঃ)-কেও বৃহত্তর কল্যাণের আভাস দিয়ে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন।

ওসমান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ও রুকাইয়া (রাঃ)-কে বিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাদীজা (রাঃ) সাময়িক ভাবে ব্যথিত হলেও ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবূ লাহাবের ঘরে যে তাদের প্রাণপ্রিয় কন্যাদ্বয়কে পুত্রবধু রূপে যেতে হয়নি– এ জন্য মনে হয় তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছিলেন এবং রাহমানুর রাহীম আল্লাহর নিকট নিশ্চয় এদের জন্য উপযোগী, সুবিবেচক, জ্ঞান, বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ মুসলিম সুপাত্রের আকাঙ্খায় প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তো আগে থেকেই তাদের জন্য পর পর সর্বোত্তম এক বর ঠিক করে রেখেছিলেন আর তিনি ছিলেন পরবর্তীকালে ইসলামের তৃতীয় খলীফা, সহিষ্ণুতা ও অমায়িক ব্যবহার, সংযম ও ধৈর্যশীলতা, দানশীলতা ও বদান্যতা, ক্ষমাশীলতা ও ধার্মিকতা প্রভৃতি অতুল্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)।

উসমান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং রুকাইয়া (রাঃ)-এর সাথে তাঁর শুভ বিবাহের চমকপ্রদ ঘটনাবলী বিভিন্ন সীরাত, আসমাউর রিজাল ও ইতিহাস গ্রন্থে বিবৃত রয়েছে। সেই সব বিবৃতির সার সংক্ষেপ নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

সম্ভ্রান্ত কুরাইশ যুবকদের মধ্যে আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)। তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের হাকামী বংশোদ্ভুত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হাশিমী বংশের অন্তর্ভুক্ত। অভিজাত কুরাইশদের মধ্যে হাশিমীদের পরেই ছিল হাকামীদের বংশ কৌলিন্যের মর্যাদা। সমগ্র কুরাইশ গোত্রের পুরুষদের মধ্যে উসমান (রাঃ) ছিলেন যেমন সৌন্দর্যে অনুপম, তেমনই চরিত্র গুণে অতুলনীয়। তাঁর ধন-দৌলত ছিল যেমন অগাধ, তেমনই তাঁর হৃদয়টিও ছিল উদার ও প্রশস্ত। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয়া কন্যা রুকাইয়াও ছিলেন অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যের

অধিকারিণী। শুধু দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, জ্ঞানে ও গুণেও তিনি ছিলেন পরম আকর্ষণীয়া।

উসমান (রাঃ) তাঁর প্রতি মনে মনে আকর্ষণ বোধ করলেও অবস্থা পরম্পরায় মনের আকাঙ্খা মনেই গোপন রেখেছিলেন। উসমান (রাঃ) নিজেই বলেছেন ঃ একদিন আমি খানায়ে কা'বায় বন্ধু বান্ধবদের সাথে বসে আছি- এমন সময় কোন এক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যা রুকাইয়ার (রাঃ) বিবাহ সম্পন্ন করলেন আবূ লাহাবের পুত্র উৎবার সাথে। রুকাইয়ার অনুপম রূপে গুণে তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের একটা অনুরাগ এবং প্রছন্ন প্রবণতা ছিল। হঠাৎ এ সংবাদে আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি উক্ত সংবাদ শুনে সেখানে আর স্থির থাকতে পারলাম না। সোজা নিজ গৃহে ফিরে আসলাম। ঘটনা চক্রে আমাদের বাড়ীতে আমার খালা আম্মা সা'দা উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি এবং কাহিনীকার। আমাকে দেখেই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতার ছন্দে বলে চললেন ঃ

ওগো উসমান! তোমার জন্য শুভ সংবাদ ঃ তোমার উপর শান্তি (সালাম) বর্ষিত হোক তিন বার, আবার তিন বার, পুনরায় তিন বার এবং তারও পরে আর একবার। এই ভাবে দশ দফা সালাম পূর্ণ হোক। তুমি পেয়ে গেছ এক উত্তম জিনিস আর বেঁচে গেছ এক খারাপ বস্তু থেকে। আল্লাহর কসম! তুমি বিয়ে করেছ এক সম্ভ্রান্ত সচ্চরিত্র সুন্দরী মেয়েকে, তুমি নিজে একজন নিষ্কলঙ্ক কুমার, পেয়ে গেছ এক পূত-চরিত্রা কুমারীকে– যে কুমারী এক বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তির কন্যা।

বিস্ময় বিস্মৃত নেত্রে খালাআম্মাকে লক্ষ্য করে উসমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ খালাআম্মা!

আপনি এ কি কথা বলছেন? এ কী করে সম্ভব?

তাঁর খালা সা'দা তখন বললেন ঃ "উসমান! হে উসমান! ওগো উসমান! তুমি নিজে সুন্দর সুপুরুষ এবং বিপুল শান শওকতের অধিকারী

আর আমাদের এ নাবী যে বস্তু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তা হচ্ছে সুস্পষ্ট প্রমাণ-সিদ্ধ, তিনি হচ্ছেন সমস্ত নাবী ও রাসূলদের সরদার। তাঁকে পাঠিয়েছেন মহান আল্লাহ। তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র কুরআন, তুমি তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে অনুসরণ করে চল। তুমি প্রতিমা পূজার ধোঁকায় আর পড়ে থেকো না।"

উসমান (রাযিঃ) বলেছেন, আমার মনের বিস্ময় এবং দ্বিধা দ্বন্দ্ব তখনও কেটে উঠল না, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। খালাআম্মার খিদমাতে নিবেদন করলাম, আমি আপনার কথার মর্ম উদ্ধার করতে পারলাম না। কথাগুলো আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলুন। তখন তিনি বলতে রাগলেন ঃ

"শুন! মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ্ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন আল-কুরআন। সে কুরআনের মাধ্যমে তিনি লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি নিয়ে এসেছেন আলোক-বর্তিকা। আর সেটা সত্যিকারের আলোক-বর্তিকা। তার দ্বীন হচ্ছে মুক্তি ও সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায় ..... ।"

এসব কথা শুনে 'উসমান (রাযিঃ)-এর চিত্ত-চাঞ্চল্য বেড়ে চলল। মনের গভীরে যাকে তিনি সযতনে স্থান দিয়ে রেখেছিলেন তার বিয়ের সম্বন্ধ তো অন্যত্র পাকা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তার খালাআম্মার কথার অর্থ কি হতে পারে? এসব ভাবনায় তাঁর মন ভীষণভাবে আন্দোলিত। তারপর রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর পিতা মুহাম্মাদ ﷺ যে নুতন দ্বীন প্রচার করছেন তার সত্যতা, স্পষ্ট প্রমাণিকতা এবং মহান আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রেরণের কথা যেরূপ নিশ্চিত প্রত্যয়ের সাথে তাঁর খালাআম্মা ঘোষণা করলেন তাতে তাঁর হৃদয়ে আর এক দিক দিয়ে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল।

ব্যক্তি জীবনে নৈরাশ্য ও আশার দ্বন্দ্ব, আর সমাজ জীবনে মহা

বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এক প্রদীপ্ত সূর্যের আবির্ভাব। তাঁর হৃদয়ে অঙ্কিত হল গভীর রেখাপাত, দেখা দিল ভীষণ চিন্তা ভাবনা।

মনের এই বিক্ষুব্ধ এবং কৌতুহল-পীড়িত অবস্থা নিয়ে উসমান (রাঃ) গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর সুখ দুঃখের বিশ্বস্ততম বন্ধু আবূ বকর (রাঃ) সমীপে।

মাঝে মাঝেই তিনি তাঁর কাছে যেতেন। তাঁর সাথে কথা বলে ও আলাপ আলোচনায় সময় কাটিয়ে তিনি আনন্দ পেতেন, উপকৃতও হতেন। প্রবল আশা নিয়েই সেই দিন তিনি তাঁর সম্মুখে গিয়ে হাযির হলেন। তাঁর চেহারায় তখন গভীর চিন্তার ছাপ। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে দেখেই তাঁর মনের অবস্থা আঁচ করতে সক্ষম হলেন।

কথা প্রসঙ্গে সুযোগ বুঝে আবূ বকর (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন– "ভাই উসমান (রাঃ)! তুমি একজন সুবিবেচক এবং বুদ্ধি-দীপ্ত মানুষ। আজও যদি তুমি হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে এবং সত্যকে চিনে উঠতে না পেরে থাকো তবে তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে? এই যে পাথরের মূর্তিগুলোকে নিজ হাতে বানিয়ে তারই পূজা ওরা করে চলেছে, তুমিই বলো, এরা কি কিছু শুনতে পায়? না কারো কোন উপকার কিংবা কোন ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা এদের আছে।"

আবূ বকর (রাঃ)-এর সহজ ভাবে বলা এই সোজা সরল কথাগুলো উসমানের (রাঃ) কানের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিল। এই ঝড়ের তীব্র আঘাতে তাঁর ভিতরের মানুষটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন ঃ "আপনি যা বলছেন, সবই ঠিক। পাথরের তৈরী প্রতিমাগুলোর এতটুকুও ক্ষমতা নেই। এদের পূজা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।" আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ "ঠিক বলেছ ভাই। চলো আর দেরী নয়, এখনই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাই, তিনি কি বলেন মনোযোগ দিয়ে শুন।

উসমান (রাঃ) তার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন এবং অনতিবিলম্বে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে হাযির হলেন। অন্য বিবরণে– ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেখানে এসে হাযির হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "হে উসমান (রাঃ)! আল্লাহ তোমাকে সুখসমৃদ্ধ চিরন্তন জীবনের পথে আহ্বান জানাচ্ছেন, তুমি সে আহ্বানে সাড়া দাও। বিশ্বাস কর, আমি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী, তোমাদের প্রতি এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি সত্য জীবন বিধান সহকারে প্রেরিত।"

উসমান (রাঃ) স্বয়ং বলছেন, একমাত্র আল্লাহই জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত কথাগুলো আমার হৃদয়ে কী এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে ফেললো, আমার মনের বিস্ময় এবং দ্বিধা দ্বন্দ্ব এক নিমিষে দূর হয়ে গেল। মুহূর্তেই সত্যের জ্যোতি আমার হৃদয়কে প্রদীপ্ত করে তুললো, স্বতঃস্ফূর্ত আমি ঘোষণা করলাম ঃ

﴿اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله﴾

আশহাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনই উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

কিছুদিনের মধ্যেই উসমান (রাঃ)-এর খালাআম্মা সা'দার আশার বাণী কার্যে পরিণত হওয়ার সুযোগ এসে গেল। আবূ লাহাব এবং উম্মু জামীলার পুত্র উৎবা রুকাইয়ার সাথে তার বিবাহের সম্পর্ক চুকিয়ে দিল, বিবাহ ভেঙ্গে গেল, অথচ রুকাইয়ার কুমারিত্ব বজায় রইল। অনুপম সৌন্দর্য, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী উসমান (রাঃ)-এর সাথে রুকাইয়ার (রাঃ) শাদী মুবারাক যথা নিয়মে সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

ওসমান (রাযিঃ)-এর উপর নিষ্ঠুর অবিচার

বাপ-দাদার ধর্ম– প্রতিমা পূজার মোহ ও অন্ধ কুসংস্কার ছেড়ে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক "লা-শারীক আল্লাহ"কে একমাত্র উপাস্যরূপে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর রাসূলরূপে মেনে নিত তাদের উপর মক্কার কাফিরদের অত্যাচার ও নিপীড়ন নিষ্করুণভাবে নেমে আসত। সে নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক জুল্‌ম নির্যাতন, অত্যাচার-অনাচারের করুণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার স্থান এখানে নয়।

রুকাইয়ার স্বামী অগাধ ধন-দৌলত, বিপুল মান-মর্যাদা এবং বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী 'উসমান (রাযিঃ)-এর প্রতি তাঁর আপনজন ও কাফিরগণ অত্যাচারের যে নিষ্ঠুর লীলা চালিয়েছিল তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে পেশ করছি।

'উসমান (রাযিঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদে তাঁর পরিবার-পরিজন এবং খান্দানের লোক সকল তাঁর প্রতি বিরক্ত এবং নারাজ হয়ে পড়ল। যখন তারা এবং কাফিরদের দল শুনতে পেল যে, তিনি রাসূল তনয়া রুকাইয়া (রাযিঃ)-কে স্বীয় সহধর্মিনীরূপে বরণ করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত হয়ে গেলেন তখন তাদের ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা-পরিসীমা রইল না।

তাবাকাত ইবনু সা'দের বরাতে প্রমাণিত হয় ঃ

'উসমান (রাযিঃ)-এর হাকাম ইবনুল 'আস নামে এক চাচা ছিল। সে ছিল এক দয়া-মায়াহীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। সে 'উসমান (রাযিঃ)-এর প্রতি একের পর এক নির্মম ও নিষ্করুণ নিপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগল। সে তাঁকে দড়ি দিয়ে বুকে-পিটে শক্ত করে বেধে চাবুকের পর চাবুকের কষাঘাত মেরে চলত। তাঁকে সে রশি দিয়ে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখত, চাটাই দিয়ে তাঁকে মুড়িয়ে নীচে থেকে ধোঁয়া দিয়ে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ

করে তুলত। কিন্তু এত কঠোর শাস্তি দিয়েও তাঁর বিদ্বেষাগ্নি নির্বাপিত হত না।

এক দিনের ঘটনা। আরবের প্রখর রৌদ্র-তাপে উত্তপ্ত বালুকাময় ময়দানে সে 'উসমান (রাযিঃ)-কে লৌহবর্ম পরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলেন। উপর থেকে মধ্যাহ্নের সূর্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে চলেছে। ফলে নিম্নের জমি উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে প্রায় আগুন হয়ে উঠেছে। আর সে উত্তাপে লৌহবর্ম লালচে হয়ে উঠেছে তখন ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত, সুখ প্রাচুর্যে পালিত 'উসমান (রাযিঃ)-এর কোমলকান্ত দেহখানা সে দুঃসহ তাপে ভাজা মাছের মত ধড়ফড় করতে লাগল। চাচা হাকাম এ অবস্থা দেখে ভাবল, এবার বাছাধনের উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে। এবার আচ্ছা রকম শিক্ষাপ্রাপ্ত ভাতিজার দ্বীনে মুহাম্মাদীর মোহ কেটে যাবে– এবার বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসবে।

কিন্তু চাচার সে আশার গুড়ে বালি! ভাতিজা সম্পূর্ণ নীরব ও নির্বিকার। মাজলূম ভাতিজার এ নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার অবস্থা দেখে জালিম চাচার ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হতে লাগল। ক্রোধ ও আক্রোশে সে হুঙ্কার দিয়ে বললো ঃ

"বল, 'উসমান তোর পূর্ব-পুরুষদের ধর্মই ভাল, না মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধর্ম?"

এবার 'উসমান (রাযিঃ) আর নীরব ও নিরুত্তর থাকতে পারলেন না। স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন। আপনাদের ধর্ম কল্পিত ও সম্পূর্ণ মনগড়া, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট। তাই দ্বীনে মুহাম্মাদীই সত্য এবং উত্তম। চাচাজান, সে একক সত্তার কসম যার হাতে 'উসমানের জীবন– আপনি যদি 'উসমানকে হত্যাও করে ফেলেন, তবু সে "লা-শারীক আল্লাহ"র সত্য দ্বীন থেকে এতটুকু বিচ্যুত হবে না।

শুধু তাঁর চাচা হাকাম ইবনুল 'আসই নয়, অন্যেরাও 'উসমানের উপর অনুরূপ জুলুমের স্টিম রোলার চালাতে কুণ্ঠাবোধ করত না। ইমাম সুয়ূতী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'উসমান (রাযিঃ)-এর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে চালাতে জালিমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু 'উসমান (রাযিঃ) সমস্ত জুলুম নির্যাতন নীরবে বরদাশত করতেন, ধৈর্যচ্যুত হতেন না।

রুকাইয়া ও ওসমান (রাযিঃ)-এর হিজরাত

কিন্তু প্রত্যেক বস্তুরই একটা সীমা আছে– ধৈর্যও তার ব্যতিক্রম নয়। 'উসমান (রাযিঃ) নিসউর থেকে নিষ্ঠুরতম জুলুম সহ্য করলেন, অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে চললেন। কিন্তু তাঁর ধৈর্যের পাত্র পূর্ণ হয়ে গেল তখন যখন কাফিররা তাকে তাঁর নিজের ঘরে নিবিষ্ট মনে আল্লাহর 'ইবাদাতে বাঁধা দিতে শুরু করল। এ ছাড়া কাফিরদের স্পর্ধা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, আশঙ্কা হল তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কলিজার টুকরা রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর উপর কোন অবাঞ্চিত আচরণ করে না বসে।

অবস্থার এ প্রেক্ষিতে তিনি রাসূলের খিদমাতে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কাফিরদের সবরকম নির্মম অত্যাচার আমি নীরবে সহ্য করে এসেছি। কিন্তু এখন যে জালিমরা আমাকে আমার নিজ গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠেও আল্লাহর 'ইবাদাত করতে দিচ্ছে না। এখন এ অবস্থায় আমাকে যদি হিজরাতের অনুমতি দিতেন তা হলে বোধ হয় ভাল হত।

ওদিকে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'উসমানের মনের কথাগুলো ব্যক্ত করার পূর্বেই জেনে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন আলিমুল গাইব এবং অন্তর রাজ্যের গোপন খবর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। 'উসমান (রাযিঃ)-এর আরজী পেশের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রত্যাদেশ নাযিল করেছেন ঃ আপনি 'উসমান এবং তার স্ত্রী রুকাইয়া (রাযিঃ)-কে হিজরাত করার আদেশ প্রদান করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান (রাঃ)-এর নিবেদন পেশ করার সাথে সাথেই আল্লাহর হুকুম মুতাবিক- আবিসিনিয়ায় রুকাইয়া (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে হিযরত করার অনুমতি প্রদান করলেন।

উসমান (রাঃ) নবী দুলালী রুকাইয়া (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে যে কাফিলার সাথে আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তাতে মোট মুহাজিরের সংখ্যা ছিল ষোল। তন্মধ্যে পুরুষ ছিলেন বার জন এবং নারী মাত্র চার জন।

তারা অত্যন্ত গোপনে- চুপিসারে মক্কা ত্যাগ করে সমুদ্র তীরে পৌঁছে যান। সৌভাগ্য ক্রমে সেখানে পৌঁছেই দুটো বাণিজ্য জাহাজ পেয়ে যান। জাহাজের কর্মকর্তাগণ দয়া করে তাদেরকে জাহাজে তুলে নেন এবং নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ক্রমে আয়িশা (রাঃ)-এর বড় ভগ্নি আসমা বিনতু আবু বকর (রাঃ) সফরের সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র গুছিয়ে দিয়ে সমুদ্র তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসেন। তাদের বিদায় দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়ে তিনি নিবেদন করেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উসমান (রাঃ) তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াকে (রাঃ) সাথে নিয়ে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

এদিকে কুরাইশগণ সংবাদ পেয়ে তাদের ধরার জন্য দ্রুতবেগে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তারা তীরে পৌঁছার পূর্বেই মুহাজির কাফিলা জাহাজে উঠে পড়েছেন এবং মাঝি-মাল্লারা জাহাজের নোঙ্গর তুলে ফেলেছে। কাজেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তারা ফিরে আসল মক্কায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ শুনে আশ্বস্ত হলেন। তিনি আবূ বকর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) এবং লূত (আঃ)-এর পর ওসমানই সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি সস্ত্রীক কাফিরদের অত্যাচার উৎপীড়নের দরুণ আল্লাহর পথে হিজরত করেন।

হিজরতের পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কন্যা ও জামাতার সংবাদ জানার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতৃ হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কোন খবরাখবর পাওয়া গেল না। উদ্বেগ ও অস্থিরতায় তিনি মাঝে মাঝে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়তেন। যখন কোন পথিককে আবিসিনিয়া থেকে মক্কার দিকে আসতে দেখতেন তখন তার কাছে গিয়ে রুকাইয়ার (রাঃ) ও উসমান (রাঃ)-এর সংবাদ নেয়ার চেষ্টা করতেন। একদা হঠাৎ এক বৃদ্ধার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে গেল। সে আবিসিনিয়া থেকে আসছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি হাবশ রাজ্যে আমার কন্য রুকাইয়া (রাঃ) এবং জামাতা উসমানকে (রাঃ) দেখতে পেয়েছ? বৃদ্ধা জওয়াবে বললেন, হাঁ তাদের আমি দেখে এসেছি। তারা ভাল আছেন, আপনি আশ্বস্ত হউন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি উদ্বেগমুক্ত হলেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ করলেন।

অবশেষে মদীনায় হিজরত

উসমান (রাঃ)-এর আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, মক্কার কাফিররা ইসলামের প্রতি বৈরী ভাব পরিত্যাগ করেছে এবং মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা কমে এসেছে। এ সংবাদ শুনে উসমান (রাঃ) তদীয় সহধর্মিণী রুকাইয়া (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে আশায় বুক বেঁধে স্বদেশে ফিরে আসলেন। কিন্তু এখানে ফিরে এসেই জানতে পারলেন, উক্ত সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন। বরং তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করলেন যে, অত্যাচারের মাত্রা পূর্বাপেক্ষা আরও বেড়েছে। এখানে অবস্থান করলে তাদেরকে আবারও দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সুতরাং উসমান (রাঃ) তার স্ত্রীকে নিয়ে আবার আবিসিনিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

মুসলমানদের মধ্যে যারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন তারা কাফিরদের অত্যাচার উৎপীড়নের যাঁতাকলে অবিরাম পিষ্ট হচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ নিজেও কাফিরদের জুলম-নির্যাতন এবং ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। সীমাহীন অত্যাচারে তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী সহায়-সম্বলহীন আল্লাহর বান্দাদের ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল– এমন সময় আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় বান ডেকে উঠল। তিনি মুসলমানদিগকে দলবদ্ধভাবে ব্যাপক আকারে মাদীনায় হিজরাত করার অনুমতি প্রদান করলেন। তারা যাত্রা শুরু করলেন।

যথাসময়ে আবিসিনিয়ায় এ খবর পৌঁছুল। 'উসমান (রাযিঃ) এ সংবাদ পেয়ে পুনরায় রুকাইয়া (রাযিঃ)-কে সাথে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাযির হলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে তঁরাও মাদীনায় হিজরাত করলেন।

আবিসিনিয়া এবং মাদীনাহ্ এ দু'স্থানে হিজরাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন– 'উসমান (রাযিঃ) এবং তাঁর জীবন-সঙ্গিনী রুকাইয়া (রাযিঃ)।

মাদীনার আনসারগণ মক্কার মুহাজিরগণকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে একেক পরিবারকে একেক বাড়ীতে আশ্রয় প্রদান করেন। শুধু আশ্রয় প্রদানই নয়, তঁরা মুহাজিরদেরকে আপন ভাইরূপে বরণ করে নেন। 'উসমান (রাযিঃ)-কে ভ্রাতৃরূপে বরণ করে নিলেন হাস্সান (রাযিঃ)-এর ভাই উয়াইস ইবনু সাবিত (রাযিঃ)।

মাদীনায় উসমান (রাযিঃ) তদীয় জীবন-সঙ্গিনীকে নিয়ে সুখের ঘর পাতলের এবং ইসলামের আদর্শে সন্তোষধন্য দাম্পত্য জীবন গড়ে তুললেন। দৈহিক সৌন্দর্য, পারস্পরিক ভালবাসায় আর একের প্রতি অপরের সুমধুর আচরণে এ সুখী দম্পতি ছিল তুলনাহীন।

রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর ইন্তিকাল

আল্লাহর ইচ্ছা ও মরযী অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। মাদীনায় তাঁদের মধুর দাম্পত্য জীবন বেশি দিন স্থায়ী হল না। হিজরাতের দ্বিতীয় বর্ষেই রুকাইয়া (রাযিঃ) হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। আর ঠিক এ সময়টিতে বদর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয় মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম জিহাদ এবং জাতি হিসেবে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জীবন মরণ সংগ্রাম। ঠিক এ সময়েই দূরারোগ্য ও কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন নাবী-নন্দিনী রুকাইয়া (রাযিঃ)। মুসলমানদের ইমাম ও নেতারূপে রাসূল ﷺ-এর পক্ষে– মুসলিম জাতির এ জীবন মরণ সংগ্রামে কন্যার কঠিন পীড়ার মত পারিবারিক কারণে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং প্রিয় কন্যাকে আল্লাহর হিফাযাতে রেখে তিনি সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু সমস্যায় নিপতিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর স্বামী 'উসমান (রাযিঃ)। একদিকে সারা জীবনের সুখ দুখের চির-সঙ্গিনী রোগ শয্যায় শায়িতা এবং মারাত্মক রোগ যন্ত্রনায় ছটফট করে চলেছেন, অপরদিকে ইসলামের প্রতি কর্তব্যবোধ– যে ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করার জন্য কাফিররা বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে এসেছে। একদিকে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা এবং দায়িত্ব– অপরদিকে ইসলামের এ মহা সঙ্কটকালে জিহাদে অংশ গ্রহণের কর্তব্যবোধ– কোনটির প্রতি তিনি অধিক গুরুত্ব দিবেন? এ দু' পরস্পর বিরোধী মানসিক দ্বন্দ্বে ইসলামের প্রতি তাঁর অটল মহব্বতই জয়ী হল। তিনিও স্ত্রীকে আল্লাহর হস্তে সোপর্দ করে জিহাদে যোগদান করতে মনস্থ করলেন এবং এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

'উসমান (রাযিঃ)-এর এ সংকল্পের কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে তিনি বুঝিয়ে বললেন ঃ " তোমাকে এবার যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখতে হবে, তুমি যুদ্ধে গেলে রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর দেখাশুনা এবং সেবা শুশ্রূষা করবে কে?" 'উসমাতন আরয করলেন, তবে কি জিহাদে যোগদানের সাওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত হবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমালেন, তোমার সহধর্মিণী রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর সেবা শুশ্রূষা করে তুমি জিহাদে যোগদানের সমান সাওয়াব পাবে, এছাড়া গাণীমাতের মালের অংশও তুমি ঠিক ঠিক মত পেয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইচ্ছা এবং নির্দেশ মুতাবিক 'উসমান (রাযিঃ) মাদীনায় থেকে গেলেন এবং স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করে চললেন। কিন্তু প্রাণপণ সেবা করেও তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। হিজরী দ্বিতীয় সালে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে স্নেহশীল মহান পিতার অনুপস্থিতিতে এবং প্রেমময় স্বামীর চোখের সামনে ধৈর্য সহিষ্ণুতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক নাবী-নন্দিনী রুকাইয়া (রাযিঃ) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)

রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালে তদীয় স্বামী 'উসমান (রাযিঃ) হৃদয়ে এক চরম আঘাত পেলেন। নাবী-নন্দিনী রুকাইয়া (রাযিঃ)-কে জীবন-সঙ্গিনী, সহধর্মিণী ও সহমর্মিণীরূপে লাভ করে তিনি যে অপার আনন্দ এবং পরম সন্তোষ লাভ করেছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বিবাহের পর থেকে সুখে-দুঃখে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে ছায়ার মতো অবস্থান করেছেন। কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 'উসমান (রাযিঃ) যখন নিজের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করতে বাধ্য হন, তখনও তিনি তাঁকে একা ছেড়ে দেননি। ইচ্ছে করলে অন্যান্যের মতো তিনিও জন্মভূমি মক্কায় থেকে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না, স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড বেছে নিলেন। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র, উষর মরুভূমি এবং বিপদ সঙ্কুল ও বন্ধুর পার্বত্য পথ অতিক্রম করার কষ্ট তিনি হৃষ্টমনে বরদাশত করেন। প্রেমময় মহান পিতার স্নেহচ্ছায়া,

দরদী ভগ্নিত্রয়ের প্রীতির আকর্ষণ এবং অন্যান্য আপন জনের মায়া মমতার বাঁধন সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করে প্রতিকূল পরিবেশের কষ্টকর প্রবাস-জীবন তিনি বরণ করে নেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়াও স্বীয় স্বামীকে তাঁর সাহচর্য দ্বারা খুশি রাখার এবং নিজে তাঁর সাহচর্যের দ্বারা খুশী থাকার বাসনা এ কষ্ট বরণের পশ্চাতে নিশ্চয় সক্রিয় ছিল। পারস্পরিক গভীর প্রেম এবং আকর্ষণে তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল মাধুর্যমণ্ডিত। যেন এক বৃন্তের দুটি সুষমামণ্ডিত ও সুবিকশিত ফুল। এ যুগল দম্পতি সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে–

"আহ্‌থআনুয যাওজাইনে রা'আহুমাল ইনসানু– রুকাইয়া ওয়া যাউজুহা 'উস্‌মান।"

"সুন্দরতম দম্পতি যা মানুষ দেখতে পেয়েছে তা হচ্ছে রুকাইয়া (রাযিঃ) এবং তাঁর স্বামী 'উসমান (রাযিঃ)।"

সে আদর্শ দম্পতির অর্ধাঙ্গিনী যখন চোখ বুঝল– বৃন্তচ্যুত হয়ে যখন কোমলতর ফুলটি ঝরে পড়ল তখন অপর অর্ধেক তথা বৃন্তযুক্ত পুষ্পটির মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

আদর্শা সহধর্মিণীর চির বিদায়ের ফলে 'উসমান (রাযিঃ)-এর হৃদয়ে বিরহের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অটল মূর্তি এবং আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে অবনত মস্তক 'উসমান (রাযিঃ) মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে বুকে পাথর বেঁধে স্ত্রীর কাফন-দাফনের আশু কর্তব্য সুসম্পন্ন করলেন।

Goto List

রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের সংবাদে মর্মাহত

সময়টি ছিল পবিত্র রামাযান মাস। হিজরাতের পর এক বৎসর ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। দাফন কার্য এ মাত্র সম্পন্ন হয়েছে, কবরে তখনও মাটি দেয়া চলছে– এমন সময় যায়িদ ইবনু হারিসা (রাযিঃ) বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মহা বিজয়ের খোশখবর নিয়ে মাদীনায় প্রবেশ করলেন।

জয়-উল্লাসে উচ্চারিত 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' এর গগণ-বিদারী আওয়াজে মাদীনার পাহাড় পর্বত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত এবং তার অলী-গলী মুখরিত হয়ে উঠল। জানা গেল, মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্বে সত্যের নিকট অসত্য পরাভূত হয়েছে, আলোর মাঝ থেকে অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে। আরও জানা গেল, বিজয়ী আনসার ও মুহাজির মুজাহিদ দল সমভিব্যাহারে রাসূল ﷺ মাদীনার দ্বার প্রান্তে উপনীত।

বিজয়ের জয়মাল্য পরে নাবী কারীম ﷺ মাদীনায় প্রবেশ করলেন। বস্তিতে ঢুকেই তিনি তাঁর প্রিয়তমা কন্যার ইন্তিকাল সংবাদ শুনে মর্মাহত হলেন। স্বভাবতঃই তাঁর পিতৃ-হৃদয় আকুলভাবে কেঁদে উঠল। শোকাকুল হৃদয়েই তিনি সোজা চলে গেলেন মাদীনার বাকী নামক কবরস্থানে– যেখানে তাঁর কন্যা রুকাইয়া (রাযিঃ) চিরশয্যা রচিত হয়েছিল।

কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দু'আ করার পর রাসূল ﷺ শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ

"উসমান ইবনু মাযউন (রাযিঃ) আগে চলে গিয়েছে, এখন তুমি গিয়ে তার সাথে মিলিত হও।"

'উসমান ইবনু মাসযউন (রাযিঃ) ছিলেন এক জন বিশিষ্ট সাহাবী, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইনি মুহাজিরদের মধ্যে সে

ব্যক্তি যিনি মাদীনায় এসে প্রথম ইন্তিকাল করেন। নাবী ﷺ-এর শোকাকুল অবস্থা ও নীরব ক্রন্দন এবং উক্ত মন্তব্য শুনে আনসার ও মুহাজিরদের মহিলারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মাদীনায় শোকার্ত মেয়ে মহলের এ করুণ কান্নায় এক বিষাদঘন অবস্থার সৃষ্টি হল। এ সময়ে কঠোর প্রকৃতি ও উগ্র মেজাজী 'উমার (রাযিঃ)-এর আবির্ভাব ঘটল। তিনি এ অবস্থা দেখে মেয়েদের শাসাতে শুরু করলেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বাঁধা দিয়ে বলেন ঃ ওমর তাদের কাঁদতে দাও, কেননা কান্নার সম্পর্ক যখন হৃদয় ও চোখের সাথে তখন আল্লাহর রহমত থেকে তা উৎসারিত। কিন্তু তাতে যদি মুখ এবং হাতের সংযোগ ঘটে (অর্থাৎ– যখন তারা উচ্চ স্বরে চিৎকার করে কাঁদে এবং হাত-পা ছুঁড়ে বুক চাপড়িয়ে ও চুল ছিঁড়ে শোকের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়) তখন বুঝবে যে তথায় শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ক্ববরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ একথাও বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লা, কন্যাদের দাফন করা একটা সম্মানজনক কাজ।"

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় মরহুমা রুকাইয়া (রাযিঃ)-এর সর্বকনিষ্ঠা বোন ফাতিমাতুয যাহরা প্রিয়তমা ভগ্নির মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হন। তিনি শোকের আতিশয্যে স্বীয় পিতা রাসুল ﷺ-এর কাছে বসে আহাজারী করে কেঁদে চলেছিলেন। রাসূল ﷺ স্বীয় চাদরের আঁচল দিয়ে তাঁর অশ্রু মুছে দিচ্ছিলেন আর ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে চলেছিলেন। এ ছিল আদর্শ নারীর আদর্শ কাজ। মানবিক সহৃদয়তার স্বাভাবিক প্রকাশ এবং নবুওয়াতী দায়িত্ব পালনের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দৈহিক সৌন্দর্য

রুকাইয়ার (রাঃ) অনুপম দৈহিক সৌন্দর্যের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সমগ্র আরবের মধ্যে কুরাইশরা ছিল সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত। স্বভাবতঃই দৈহিক সৌন্দর্যেও তারা ছিল সকলের উর্ধ্বে। তাদের মেয়েরাও হত প্রায়শঃ সুন্দরী। সে সময়ে সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে যারা ছিল সুন্দরতম, রুকাইয়া (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর দৈহিক গঠন ও রূপের খ্যাতি সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জীবনসাথী রূপে যাঁকে জুটিয়ে দেন সেই উসমান (রাঃ) ও ছিলেন তেমনি আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের অধিকারী। সমসাময়িক কুরাইশ যুবকদের মধ্যে সৌন্দর্যে কেউ তাঁর মতো ছিল না বললেই চলে।

যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। উভয়কে একত্রে দেখলে মনে হত কী চমৎকার মানিয়েছে তাদের মিলন। এমন মিলন খুব কমই ঘটে থাকে।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদিম ছিলেন বালক উসামা ইবনু যায়িদ। একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাঠালেন উসমানের (রাঃ) গৃহে। উসামা (রাঃ) নিজেই বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু ভুনা গোশত দিয়ে বললেন ঃ যাও, উসমান (রাঃ)-এর ঘরে দিয়ে এস। আমি সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম উসমান (রাঃ) এবং রুকাইয়া (রাঃ) একই চাটাইয়ে বসে আছেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমি একবার তাকাই রুকাইয়া (রাঃ)-এর দিকে, আর একবার তাকাই উসমান (রাঃ)-এর দিকে! ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একথা উল্লেখ করলাম। তিনি খুশী হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বল দেখি, তুমি কি এদের চাইতে সুন্দরতর আর কোন মিঞা-বিবি দেখেছ? আমি বললাম, জী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

চারিত্রিক গুণাবলী

শুধু দৈহিক সৌন্দর্যেই নয়, রুকাইয়ার চারিত্রিক গুণাবলীও ছিল অতুলনীয়। খাদীজাতুল কুবরার (রাঃ) ক্রোড়ে প্রতিপালিত আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাক্ষাৎভাবে সুশিক্ষা-প্রাপ্ত রুকাইয়ার (রাঃ) মধ্যে উভয়ের নৈতিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতিগত ভাবে লাজুক, কথায় ও আচরণে শালীন, চরিত্রে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ। পরম ধৈর্যশীল, অল্পতেই তুষ্ট, বিপদে আপদে অচঞ্চল ও সুদৃঢ়। কষ্ট বরণে তিনি পুরুষদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন– কাফিরদের নির্মম আচরণ ও নিষ্করুণ নিপীড়ন তিনি নীরবে বরদাশত করেছেন, মুখে আহ্ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি।

পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, মহব্বত ও খিদমাত এবং স্বামীর প্রতি অটল ভালবাসা আর সুখে দুঃখে তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যে অবস্থানের যে অতুল্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন তা কিয়ামত অবধি মুসলিম কন্যা, ভগ্নি ও স্ত্রীদের অনুসরণের জন্য চিরন্তন প্রেরণার উৎসরূপে বিরাজ করবে।

পিতা-কন্যার সম্পর্ক

বিবাহের পূর্বে তো বটেই, বিবাহের পরও রুকাইয়া (রাঃ) তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের সেবা যত্নে-ছিলেন বিশেষ অগ্রণী। পরম আগ্রহ সহকারে তিনি তাঁর নাসীহাত শুনতেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে পালনে সচেষ্ট হতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তিনি নিজ হাতে তাঁর মাথায় তৈল দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে সুরমা লাগান খুব পছন্দ করতেন বলে তিনি পিতার চোখে নিজ হস্তে সুরমাও লাগিয়ে দিতেন।

একবার এমনি যত্নের সাথে রুকাইয়া (রাঃ) তাঁর আব্বা জানের সেবা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতূহল বশতঃ কন্যাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, বেটী! তোমার প্রতি উসমানের (রাঃ) ব্যবহার কেমন? উত্তরে রুকাইয়া (রাঃ) বললেন ঃ অত্যন্ত ভাল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জওয়াবে অত্যন্ত খুশী হলেন। তারপর উপদেশ দিয়ে বলেন, উসমান (রাঃ) একজন সম্মানী ব্যক্তি তাঁর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমাদের সাথে তাঁর অভ্যাস ও চাল চলনে অনেক মিল রয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক

রুকাইয়া (রাঃ) আর উসমান (রাঃ)-এর মধ্যে কী গভীর প্রেম ও অটুট পারস্পরিক আকর্ষণ ছিল– তা আমরা তাঁদের মিলিত জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে দেখতে পেয়েছি। আবাসে হউক অথবা প্রবাসে– যেখানেই তারা বসবাস করেছেন সেখানেই তাদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি প্রগাঢ় প্রণয়প্রীতির স্বতঃস্ফূর্ত ঝলক। একের প্রতি অপরের সমঝোতা, সহযোগিতা ও সহৃদয়তা মূলক আচরণ। আমরা তাঁদের মধ্যে দেখতে পাই অকপট আন্তরিকতা– যার নযীর একান্তই বিরল। এজন্য লোকের মুখে প্রবচনের মত হয়ে দাঁড়ায় এই কথা ঃ

"পৃথিবীর মানুষ যত সুন্দর ও সুখসমৃদ্ধ দম্পতি দেখেছে তার মধ্যে সুন্দরতম হচ্ছে রুকাইয়া (রাঃ) এবং তার স্বামী উসমান (রাঃ)।"

সন্তান

উসমান (রাঃ) এবং রুকাইয়া (রাঃ)-এর মিলনজাত একটি মাত্র সন্তান ছিল, নাম আবদুল্লাহ। তার থেকেই উসমানের (রাঃ) উপনাম ছিল আবূ আবদিল্লাহ– আব্দুল্লাহর পিতা। আবিসিনিয়ায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। সুন্দর চেহারা ও লাজুক প্রকৃতির এই সন্তানটি পিতামাতার প্রতি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। তার নানাজান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মনে হয় রুকাইয়ার (রাঃ) মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চার বৎসর। দুই বৎসর পর ৪র্থ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর কারণটি মর্মান্তিক। একটি মোরগ হঠাৎ তাঁর চোখে ঠোকর দেয়ায় সেই চোখে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ক্রমেই ক্ষতের যন্ত্রণা বেড়ে চলে এবং পরিণামে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকাহত হৃদয়ে স্নেহময় নাতীর জানাযার নামায পড়ান এবং উসমান (রাঃ) তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তানের মৃতদেহ কবরে রাখেন।

[রুকাইয়া (রাঃ)-এর জিবনী সমাপ্ত]

উম্মু কুলসূম (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

উম্মু কুলসূম (রাঃ)-এর জন্ম ও পরিচয়

উম্মু কুলসূম (রাঃ) খাদীজাতুল কুবরার (রাঃ) গর্ভজাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয়া কন্যা। তাঁর আসল নাম ছিল উমাইয়া আর কুনিয়াত বা উপনাম ছিল উম্মু কুলসূম। উপনামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

উম্মু কুলসূমের (রাঃ) জন্ম তারিখ, ইতিহাস এবং জীবনী গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু রুকাইয়ার (রাঃ) জন্ম হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের ৭ বৎসর পূর্বে এবং ফাতিমার (রাঃ) জন্ম হয় ৫ বৎসর পূর্বে এবং যেহেতু এটা স্বীকৃত সত্য যে, রুকাইয়া (রাঃ) ছিলেন উম্মু কুলসূমের (রাঃ) বড় এবং ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন ছোট, কাজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উম্মু কুলসূমের (রাঃ) জন্ম হয় নবুওয়াতের ৬ বৎসর পূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ৩৪ বৎসর বয়সে।

কোন কোন মতে নবুওয়াতের দুই বৎসর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ৩৮ বৎসর বয়সে উম্মু কুলসূমের (রাঃ) জন্ম হয়। এটা মেনে নিলে উম্মু কুলসূম (রাঃ)-কে ফাতিমার (রাঃ) তিন বৎসরের ছোট বলে মেনে নিতে হয় যা হবে স্বীকৃত সত্যের বিপরীত আর রুকাইয়া (রাঃ) এবং উম্মু কুলসূমের (রাঃ) একই সাথে আবূ লাহাবের দুই পুত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যহীন।

উম্মু কুলসূমের (রাঃ) জীবনী সম্পর্কে বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর শৈশবের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আবূ লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে তাঁর বিয়ের কথা এবং "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিউঁ" আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর উক্ত বিবাহ বন্ধনের বিচ্ছেদ হওয়ার ঘটনা।

বিয়ে ও তালাক

আবূ লাহাবের প্রথম পুত্র উৎবা যে অবস্থায় রুকাইয়া (রাঃ)-কে তালাক দিয়ে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে যা রুকাইয়ার (রাঃ) জীবন-কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে, ঐ একই উপায়ে উতাইবাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয়া কন্যা উম্মু কুলসূম (রাঃ)-কে রুখসতী অর্থাৎ স্বামী গৃহে গমনের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়। কিন্তু তালাক দিয়েই সে ক্ষান্ত হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সে বেয়াদবীর চূড়ান্ত পরিচয় দিতে থাকে। অত্যন্ত আপত্তিকর ও অসম্মানসূচক বাক্যাবলী সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে উচ্চারণ করে চলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে এ সব কথা আসতে থাকে। তিনি ব্যথিত এবং মর্মাহত হন। একদিন উতাইবার এমনি এক মর্মবিদারী বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর আহত হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে এই কথা তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে ঃ পরওয়ারদিগার! তোমার দুই সৃষ্ট জীবের (বাঘ ও সিংহ) মধ্য থেকে একটিকে এই বদবখতের পিছনে লাগিয়ে দাও।

উতাইবা যেভাবে ধ্বংস হলো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাৎকারী রূপে অবতীর্ণ না হলেও তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা– উক্ত বদ-দু'আ ব্যর্থ হতে পারে না। আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হয় এবং উতাইবা অপমৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বদ-দু'আ শুনার পর মুহূর্ত থেকে উতাইবার মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তার পিতা আবূ লাহাবের মনেও আতঙ্ক দেখা দেয় এবং উভয়ের চেহারায় ত্রাস ও আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠে।

কিছুদিন পর উতাইবা এবং আবূ লাহাব উভয়ে বাণিজ্য উপলক্ষে

সিরিয়া যাত্রা করে। পথিমধ্যে এক স্থানে হঠাৎ উতাইবার মনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদ-দু'আর কথা উদিত হয়, সাথে সাথে আশঙ্কা ও আতঙ্ক তার হৃদয়কে গ্রাস করে ফেলে। ভয় হয় কখন কোন মুহূর্তে অতর্কিতে বাঘের আক্রমণ ঘটে যায়। তার সঙ্গী সাথীরা তাকে নানা কথায় নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। তবু আতঙ্ক দূর না হওয়ায় অবশেষে কাফিলার বাণিজ্য সম্ভার দিয়ে চারিদিকে প্রাচীরের মত এক রক্ষাব্যূহ তৈরী করে উতাইবাকে তার মধ্যস্থলে রেখে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মারে আল্লাহ রাখে কে?

রাত্রি গভীর হয়ে চলল। মধ্যরাত্রি পার হওয়ার পর কোথা থেকে কোন দিক দিয়ে সহসা এক হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব ঘটল। সে জন্তু এক লাফে মালপত্রের প্রাচীর টপকে একেবারে উতাইবার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল এবং এক পলকের মধ্যে তার ঘাড় মটকিয়ে তাকে পীঠে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। যারা উতাইবার পাহারায় নিয়োজিত ছিল তারা ভীত চকিত নয়নে এই অচিন্তপূর্ব ভয়াবহ দৃশ্য শুধু দেখতে পেল কিন্তু কিছুই করতে পারল না। কাঠের পুতুলের ন্যায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর হতভম্ব হয়ে গেল।

উসমান (রাঃ)-এর সাথে উম্মু কুলসূমের শুভ বিবাহ

একথা আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি যে, উসমান (রাঃ) তদীয় প্রথমা স্ত্রী রুকাইয়া (রাঃ)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। এই ভালবাসা রুকাইয়ার (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত অব্যাহত এবং অবিচল ছিল। তাঁর ইন্তিকালে উসমান (রাঃ) শোকে মুহ্যমান হলেন। তিনি সব সময় চিন্তাযুক্ত থাকতেন। তাঁর চিন্তা এবং উদ্বেগের ছাপ তাঁর চেহারায় ধরা পড়ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁকে এরূপ বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আবদিল্লাহ! (উসমান (রাঃ)-এর উপনাম) তোমাকে সর্বদাই বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত দেখতে পাই, এর কারণ কি?

উসমান (রাঃ) জওয়াবে বললেন ঃ রুকাইয়ার (রাঃ) মৃত্যুতে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে। আমার উপর এমন মুসীবত নাযিল হয়েছে যা আর কারও উপর নাযিল হয়নি। তাঁর মৃত্যুশোকে আমার হৃদয় ভেঙ্গে খান-খান হয়ে গেছে। বিশেষ করে তাঁর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা ছিন্ন হয়েছে, ফলে যে নৈকট্য অর্জিত হয়েছিল তাও ব্যাহত হয়ে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তখন আশ্বস্ত করে বললেন ঃ "তুমি চিন্তিত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না। সাধারণ লোকের মধ্যে বৈবাহিক কারণে অর্জিত সম্পর্ক স্ত্রীর মৃত্যু দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলেও তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা এমন নয় যে, আমার কন্যা রুকাইয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুতে তা ছিন্ন হয়ে যাবে।" একথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবছিলেন কি করে উসমানের (রাঃ) শোক দূরীভূত এবং দুঃখ কষ্টকে আনন্দ উল্লাসে পরিণত করা যায়। এমন সময় জিব্রীল (আঃ) ঐশী বাণী নিয়ে হাজির হলেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার নিকট তাঁর পয়গাম পাঠিয়েছেন, "আপনার চোখের জ্যোতিঃ উম্মু কুলসূমকে রুকাইয়ার মোহরেই উসমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিন। আর তাকে একথা বলে দিন ঃ সে যেন উম্মু কুলসূম (রাঃ)-কে ঠিক রুকাইয়া (রাঃ)-এর মত ভালবাসে এবং তেমনি আদর যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথেই তাঁকে উক্ত খোশখবর শুনালেন। উসমান (রাঃ)-এর তখন সমস্ত দুঃখ বেদনা আনন্দে রূপান্তরিত হল। সেই আনন্দের কোন সীমা পরিসীমা রইল না।

হিজরী তৃতীয় বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসে রুকাইয়ার (রাঃ) মোহরেই উসমান (রাঃ)-এর সাথে উম্মু কুলসূম (রাঃ)-এর শুভ বিবাহ যথারীতি সুসম্পন্ন হল।

যুন্‌ নূরাইন

উসমান (রাযিঃ) এ বিবাহের ফলশ্রুতিতে একটি বিশেষ খিতাবে (উপাধিতে) ভূষিত হলেন আর তা হল যুন্‌-নূরাইন– অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী। এ দুই নূর হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই কন্যা। 'উসমান (রাযিঃ) পর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছাড়া কোন ব্যক্তির নাবীর দু'কন্যার স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য কারো ভাগ্যে ঘটেনি। এ ব্যাপারে তিনি একক এবং অন্যান্য বহু দিকের ন্যায় এ দিক দিয়েও তিনি বিশেষ ফাযীলাত এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে স্ত্রীর গৌরবানুভূতি

আদর্শ স্ত্রীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা তাদের স্বামীদের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন দেখতে এবং তাদের গুণগান শুনতে অভিলাষী হন এবং তাদের গৌরব বোধ করে থাকেন। রাসূল-কন্যা উম্মু কুলসূম (রাযিঃ) মধ্যেও আদর্শ নারী চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল।

এক দিনের কথা। উম্মু কুলসূম (রাযিঃ)-এর মনে এ কৌতূহল জাগ্রত হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ﷺ-এর নিকট তাঁর স্বামীর আসন কোথায়– বিশেষ করে তাঁর ছোট বোন ফাতিমা (রাযিঃ)-এর স্বামী 'আলী (রাযিঃ)-এর মুকাবিলায়।

যেমন মনে হওয়া তেমনি তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা রাসূল ﷺ-এর দরবারে গিয়ে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ আব্বাজান! অনুমতি পেলে আমি আপনার খিদমাতে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। স্নেহপ্রবণ পিতা মুচকি হেসে বললেন ঃ হ্যাঁ বেটি, নিশ্চয়, বল– তোমার প্রশ্নটা কি?

লজ্জাবনত বদনে, বিনয়-নম্র বচনে উম্মু কুলসূম (রাযিঃ) আরয

করলেন, আমার মনে কৌতূহল জেগেছে এই কথা জানতে যে, আমার স্বামী উসমান (রাঃ) এবং ফাতিমার (রাঃ) স্বামী আলী (রাঃ) এর দু'জনের মধ্যে কার মর্তবা শ্রেষ্ঠতর কার মর্যাদা উচ্চতর?

প্রশ্নটা ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সূক্ষ্মতাত্ত্বিক। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া সাধারণতঃ সুকঠিন। বিশেষ করে যখন এর সাথে কন্যার ভাবাবেগ, স্বামীর প্রতি অনুরাগ-ভক্তি এবং গৌরববোধ জড়িত। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক রূপে যার আগমন ঘটেছিল এবং মানব প্রকৃতি সম্পর্কে যার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর তাঁর পক্ষে এর সন্তোষজনক উত্তরদান কঠিন ছিল না। তিনি ক্ষণিকের জন্য খামোশ থেকে পরক্ষণেই উত্তর দিলেন ঃ

প্রিয় কন্যা! তোমার এই কথা শুনে খুশী হওয়া উচিত যে, তোমার স্বামী উসমান (রাঃ) ঐ সব ভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্যতম যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অন্তর দিয়ে ভালবাসে এবং আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে অনুরূপ ভালবাসেন।

তারপর তিনি বললেন ঃ

আমি যখন বেহেশতে ভ্রমণরত ছিলাম তখন দেখতে পেলাম তোমার স্বামীর বালাখানা সব চেয়ে প্রশস্ত, সব চেয়ে উচ্চ– আমার অন্য কোন সাহাবীর জন্য এর চাইতে প্রশস্ততর ও উচ্চতর বালাখানা আর একটাও দেখতে পেলাম না। তাঁর এই বিশেষ মর্যাদা এজন্যই দেয়া হবে যে, কিছু লোক তাঁকে হত্যা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠবে আর সেদিন উসমান (রাঃ) সবর এবং শুকরিয়ার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

গুণাবলী ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

সৎ-স্বভাব, অমায়িক ব্যবহার এবং মিষ্টি ভাষা ছিল উম্মু কুলসূমের (রাঃ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

তিনি তাঁর স্বামীর খিদমত করতেন তাঁর দরদ মাখা অন্তর দিয়ে। উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল মাধুর্যমণ্ডিত। মাত্র ছয় বৎসরের কিছু অধিককাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল তাদের মিলিত জীবন। এই সময়ে তাঁদের প্রেম ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ সম্পর্কটি নিরন্তর এমন মধুময় ছিল যে, একদিনের জন্যও তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়নি, কারো বিরুদ্ধে কারো কোন দুঃখ অভিযোগ ছিল না। এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, উম্মু কুলসূম (রাঃ) স্বীয় সম্মানিত পিতার নির্দেশ-ক্রমে সর্বদা স্বামীর কথামত চলতেন এবং তাঁর খিদমত করতে ব্যস্ত থাকতেন। অপর পক্ষে তিনি পিতার সেবার কোন সুযোগ যখন পেতেন তখন তার সদ্ব্যবহার করতেও উন্মুখ থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর গৃহে প্রবেশ করতেন তখন তিনি মনে-প্রাণে তাঁর খিদমত করতেন।

ওফাত

উম্মু কুলসূম (রাঃ) নবম হিজরীর শাবান মাসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সম্ভাব্য সব রকম চিকিৎসা সত্ত্বেও আল্লাহর ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হল। প্রিয় স্বামী এবং সম্মানিত পিতাকে শোকাকুল করে তিনি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মায়া ছেড়ে অপরিণত বয়সে চিরস্থায়ী ঠিকানায় প্রস্থান করলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নয়নমণি ও কলিজার টুকরাকে গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। উম্মু আতিয়াহ, আসমা বিনতে উমায়স, সাফিয়া বিনতু আবদুল মুত্তালিব এবং লাইলা বিনতু কায়িফ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মত তাঁর গোসল দিলেন। গোসল শেষে যখন তিনি লাইলা বিনতু কায়িফের নিকট একটির পর একটি কাফনের কাপড় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চক্ষু যুগল থেকে টপ টপ করে অশ্রু ধারা ঝরে পড়ছিল।

বলাবাহুল্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তার জানাযার নামায পড়ালেন।

তাঁকে মাদীনার 'বাকী' নামক কবরস্থানে দাফন করা হল। অনুমতি ক্রমে আবূ তালহা, আলী, ফযল ইবনু আব্বাস এবং উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) একের পর এক কবরে অবতরণ করেন। উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) দেহ কবরে শায়িত করলেন।

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহাকে কবরে নামার অনুমতি দিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে অবস্থান করছিলেন। দেখা গেল তখন তাঁর পবিত্র চক্ষুদ্বয় থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু বয়ে চলেছে।

দাফনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ বিয়ে দেয়ার মত আমার আর কোন কন্যা নেই– যাকে উসমানের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিতে পারি, থাকলে তৃতীয় দফায় আমি তাকেও উসমানের (রাঃ) হাতে সঁপে দিতাম।

আলী (রাঃ) বলেন ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আল্লাহ আমাকে চল্লিশ জন কন্যা দিতেন তা হলে প্রয়োজনে আমি একের পর এক প্রত্যেককে উসমানের (রাঃ) নিকট বিয়ে দিতাম– আমার শেষ মেয়েটি পর্যন্ত।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমার একশতটি মেয়ে থাকত এবং একের পর একটি মারা যেতো– তবু আমি তাদের প্রত্যেকের বিবাহ উসমানের (রাঃ) সাথে দিতে থাকতাম।

[উম্মু কুলসূম (রাঃ)-এর এর জীবনী সমাপ্ত]

ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

ফাতিমা (রাঃ)-এর পরিচয় ও জন্ম

ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম ছিল উম্মু মুহাম্মদ। তাঁর মধ্যে চরিত্র-মাধুর্যের সব রকম গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তাঁর মাতার নাম খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রাঃ)। তিনি সারা জাহানের নারীদের সর্দার এবং জান্নাতেও তিনি হবেন নারীকুলের সর্দার। উপাধী হচ্ছে তাহিরা, মুতাহ্হারা, যাকিয়া, রাযিয়া, মারযিয়া এবং বতুল। **(আল-ইসাবাহ)**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পাঁচ বৎসর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছে। এটা ছিল এক মুবারাক সময়। এ সময় কুরাইশগণ কাবা শরীফ পুনঃ নির্মাণে ব্যস্ত ছিল। **(তাবক্বাত)**

ইবনু সিরাজ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আলহাশিমীর রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ নবুওয়াতের প্রথম বর্ষে ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্ম হয়েছে। আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণ কাজ চলছিল, সে সময় ফাতিমার (রাঃ) জন্ম হয়েছে। **(আল-ইস্তিআব)**

বিবাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন ফাতিমার বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর নানান দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। অনেকেই ফাতিমা (রাঃ)-কে বিয়ে করার জন্য আলী (রাঃ)-কে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু নিজের অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করে তিনি ইতঃস্তত করেন যে, আবুবকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ)-এর পর আমার আর স্থান কোথায়। **(ইসাবাহ)**

এর পরও লোকেরা পীড়াপীড়ি করলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফাতিমা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ প্রস্তাব কবূল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রাঃ)-কে বলেন ঃ আলী তোমার প্রতি আগ্রহী। তিনি চুপ থাকেন। এ চুপ থাকাও ছিল এক ধরনের সম্মতি। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাঃ)-এর বিয়ের চার মাস পর দ্বিতীয় হিজরীর মুহাররাম মাসের প্রথম দিকে ফাতিমা (রাঃ)-কে আলী (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে দেন।

(উস্‌দুল গাবাহ)

অন্যান্য জীবনী লেখকদের বর্ণনা অনুযায়ী এ বিয়ে হয় উহুদ যুদ্ধের পর। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আয়িশাকে (রাঃ) ঘরে তুলে আনার সাড়ে চার মাস পর এ বিয়ে হয় এবং সাড়ে সাত মাস পর আলী (রাঃ) ফাতিমাকে ঘরে তুলে নেন। **(উস্‌দুল গাবাহ)**

তখন ফাতিমা (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ১৫ বছর সাড়ে চার মাস। আর আলী (রাঃ)-এর বয়স ছিল ২১ বছর সাড়ে পাঁচ মাস। **(ইস্তিআব)**

আলী (রাঃ) বয়সে ফাতিমা (রাঃ)-এর চেয়ে প্রায় ৬ বছরের বড় ছিলেন। বিয়ের জন্য আলী (রাঃ) তাঁর উট এবং অন্যান্য আসবাবপত্র

বিক্রয় করেন। এসব বিক্রি করে চার শত ৮০ দিরহাম সংগৃহীত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই তৃতীয়াংশ সুগন্ধি ইত্যাদির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ অন্যান্য কাজে ব্যয় কর। (তাবাক্বাত)

আলী (রাঃ) স্বয়ং নিজে বর্ণনা করেন ঃ আমার এক দাসী ছিল, যাকে আমি আযাদ করে দেই। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্য কেউ কি বিয়ের প্রস্তাব করেছে? আমি বললাম ঃ জানি না। এরপর সে বললো, আপনি পয়গাম দিন, এতে বাধা কিসের? আমি বললাম, কিসের ভিত্তিতে? আমার তো কিছুই নেই। সে আবার বলে ঃ না, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হন। বারবার দাসী বলায় আমি দরবারে হাযির হই। কিন্তু তাঁর প্রভাব ও ভীতি আমার উপর এমন ক্রিয়া করে যে, কিছুই বলার সাহস আমার হয়নি। আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। কিছু বলার ক্ষমতাই ছিল না আমার। কিন্তু তিনিই বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফাতিমার (রাঃ) জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছ? আমি বললাম, জি জনাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মাহরানা আদায় করার মতো তোমার কাছে কিছু আছে? আমি বললাম, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে যে লৌহ বর্ম দিয়েছিলাম, তা কোথায়? তাই মাহরানা হিসেবে দাও। তার মূল্য চারশ দিরহামের বেশী ছিল না। বিয়ে হয়ে যায় এবং সেটাই মাহরানা হিসেবে দেওয়া হয়। (উসূদুল গাবাহ)

অপর এক বর্ণনা মতে একদল আনসার আলী (রাঃ)-কে উৎসাহিত করলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার? তিনি আরয করলেন ঃ আমি ফাতিমা (রাঃ)-কে বিয়ে করতে আগ্রহী। তিনি বললেন ঃ আহলান মারহাবা। আলী (রাঃ) বাইরে এলে অপেক্ষমান আনসার দল জানতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কি জবাব দিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ আহলান মারহাবা ছাড়া কিছু বলেননি। তারা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এতটুকুই বলা যথেষ্ট।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ বিয়ের জন্য ওয়ালীমাও জরুরী। সা'আদ (রাযিঃ) বললেন, আমার কাছে একটা ভেড়া আছে, তা দিয়ে ওয়ালীমা করা যায়। আনসারদের একটা কাবীলাও সাধ্য অনুযায়ী ওয়ালীমার ব্যবস্থা করে। তদানুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করা হয়। **(তাবাক্বাত)**

'আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘর থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট ঘর ভাড়া নেন। রাসূল ﷺ তাঁর দাসী উম্মু আইমানসহ ফাতিমা (রাযিঃ)-কে 'আলী (রাযিঃ)-এর ঘরে বিদায় দেন। বিদায়ের সময় তিনি বলেন ঃ তুমি আমার সাথে দেখা করবে। এরপর তিনি 'আলী (রাযিঃ)-এর ঘরে যান। পানি চেয়ে নিয়ে ওযূ করেন এবং তাঁর গায়ে ওযূর পানি ছিটিয়ে এ দু'আ করেন ঃ

"اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما"

"হে আল্লাহ! তাদেরকে বরকত দাও, তাদের ওপর বরকত নাযিল কর এবং তাদের বংশে বরকত দাও।" **(তাবাক্বাত)**

মাহরানা ও উপঢৌকন

'আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি যখন বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করি, তখন মাহরানা আদায় করার মতো কিছুই ছিলো না আমার কাছে। আমি যখন এ নিয়ে চিন্তিত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি মাহরানা কি দেবে? আমি বললাম ঃ আমার কাছে তো কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে যে লৌহ বর্মটি দিয়েছিলাম, তা কোথায়? আমি বললাম, তা আমার কাছে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে তাই মাহরানা হিসাবে দাও। মাহরানা হিসাবে আমি তাই ফাতিমা (রাযিঃ)-কে দেই। ইকরামা বলেন ঃ লৌহ বর্মটির মূল্য ছিল মাত্র চার দিরহাম।

(তাবাক্বাত)

বস্তুত এ বর্ণনায় লৌহ বর্মের মূল্য চার দিরহাম বলে উল্লেখ করা বর্ণনাকারীর ভুল। আসলে তা হবে চার'শত দিরহাম। অন্যান্য বর্ণনায় চারশত আশি দিরহাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলের একমত যে, ফাতিমা (রাযিঃ)-এর মাহরানা চার'শত আশি দিরহামের কম ছিল না।

ইকরামা (রাযিঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাযিঃ)-কে নিম্নোক্ত হাদিয়া দেন ঃ নকশা করা খাট ১(এক)টি, বালিশ ১(এক)টি– যার ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল, পেয়ালা ১(এক)টি, মশক ১(এক)টি।

অন্যান্য জীবন চরিতকারের বর্ণনা মতে–

কাপড়ের বালিশ ১(এক)টি– যাতে ভরা ছিল খেজুরের ছাল,

চাক্কী ২(দু')টি, মশক ২(দু')টি এবং কলসী ২(দু')টি। (তাবাক্বাত)

সন্তান

ফাতিমা (রাঃ)-এর গর্ভে ২টি পুত্র সন্তান ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন এবং ২টি কন্যা সন্তান– উম্মু কুলসূম ও যায়নাব (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। (আল-ইস্তিআব)

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিচারে এরা সকলেই ইসলামের ইতিহাসে মাশহুর হয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সকলকেই অত্যন্ত ভালবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাদের মধ্যে কেবল ফাতিমা (রাঃ) এ গৌরব লাভ করেন যে, তাঁর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশ টিকে আছে।

(উসূদুল গাবাহ)

অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুহসিন এবং রুকাইয়া নামেও তাঁর দু'সন্তান ছিলেন–(যারকানী)। যারা শৈশবেই মারা যান।

মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মাটির উপর চারটি রেখা টেনে সাহাবা (রাঃ)-দের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ তোমরা জান এটা কি? সকলেই বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ ফাতিমা (রাঃ) বিনতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খাদীজা (রাঃ) বিনতু খুওয়াইলিদ, মারইয়াম বিনতু ইমরান এবং আসিয়া (আঃ) বিনুত মুযাহিম, জান্নাতবাসী নারীদের মধ্যে এদের ফযীলত সবচেয়ে বেশী। (ইস্তীআব)

ফাতিমা (রাঃ)-এর ফযীলত সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

"তোমাদের অনুসরণের জন্য দুনিয়ার স্ত্রীদের মধ্যে মারইয়াম ('আঃ) বিনতু ইমরান, খাদীজা (রাযিঃ) বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা (রাযিঃ) বিনতু মুহাম্মাদ ﷺ এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ('আঃ) যথেষ্ট।"

ফাতিমা (রাযিঃ) জীবনের সকল কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করতেন। আয়িশাহ্ সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি উঠা-বসা, চাল-চলন এবং কথা বলার ভাব-ভঙ্গীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফাতিমা (রাযিঃ)-এর চেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ কাউকে দেখিনি। ফাতিমা (রাযিঃ) রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন, কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। **(আবূ দাউদ)**

উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ চাল-চলন এবং কথা বলার ভাব-ভঙ্গীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উৎকৃষ্ট নমুনা ছিলেন ফাতিমা (রাযিঃ) এবং রাসূলের চেহারার সাথে ফাতিমা (রাযিঃ)-এর চেহারার অনেকটা মিল ছিল। আয়িশাহ্ সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমার চক্ষু ফাতিমা (রাযিঃ)-এর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখেনি। **(ইসাবা)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

"فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّى فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِى"

"ফাতিমা আমার দেহের একাংশ। যে তাকে নারায করবে, সে আমাকে নারায করবে।" **(বুখারী [তাওহীদ পাবলিকেশন্স, হাঃ ৩৭৬৭])**

উম্মু সালমাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমার ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবস্থান করছিলেন। এমন সময় ফাতিমা (রাযিঃ) রেশমী কাপড়েরর একটি পুঁটলিতে করে কিছু নিয়ে আসলেন। রাসূল ﷺ বললেন ঃ "তোমার

স্বামীকে ও দুই শিশুকে নিয়ে এসো।" সুতরাং তারাও এসে গেলেন ও খেতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিছানায় ছিলেন। বিছানায় খাবারের একটি উত্তম চাদর বিছানো ছিল। আমি কামরায় নামায পড়ছিলাম। এমন সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো–

﴿ ينساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا ، وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ﴾

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তিনি চাদরের ভিতর থেকে হাত দু'টি বের করলেন এবং আকাশের দিকে উঠিয়ে দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহলি বাইত ও আমার সাহায্যকারী। আপনি এদের অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং এদেরকে পবিত্র করুন!" আমি আমার মাথাটি ঘর থেকে বের করে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমিও তো আপনাদের সবারই সাথে রয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ "হ্যাঁ অবশ্যই। তুমি তো সদা কল্যাণের উপর রয়েছে। (মুসনাদ আহমাদ)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন ঃ "একদা আমার সামনে আলী (রাঃ)-এর আলোচনা শুরু হলো। আমি বললাম ঃ আয়াতে তাতহীর তো আমার ঘরে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বললেন– "কাউকেও এখানে আসার অনুমতি দেবে না।" অল্পক্ষণ পরেই ফাতিমা (রাঃ) আসলেন। কি করে আমি মেয়েকে তাঁর পিতার নিকট যেতে বাধা দিতে পারি? অতঃপর হাসান (রাঃ) আসলেন। কি করে নাতিকে তাঁর নানার কাছে যেতে বাধা দিতে পারি? তারপর হুসাইন (রাঃ) আসলেন। তাঁকেও আমি বাধা দিলাম না। এরপর আলী (রাঃ) আগমন করলেন। তাঁকেও

আমি বাধা দিতে পারলাম না। তাঁরা সবাই যখন একত্রিত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহলি বাইত। সুতরাং আপনি এদের অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং এদেরকে পবিত্র করুন।" ঐ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন এঁদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হলো তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমিও কি এদের অন্তর্ভুক্ত? কিন্তু আল্লাহ জানেন, তিনি আমার এ প্রশ্নে সন্তোষ প্রকাশ করলেন না। তবে শুধু বললেন ঃ "তুমি কল্যাণের দিকেই রয়েছো।" (ইবনু কাসীর)

ইবনু হাওশিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচাতো ভাই হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ একদা আমি আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করে তাঁকে আলী (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি আমাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছো যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর বাড়ীতেই তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন। যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সবচেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্রী। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি আলী (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)-কে আহ্বান করেন। অতঃপর তিনি তাঁদের উপর কাপড় নিক্ষেপ করেন এবং বলেন– "হে আল্লাহ! এরা আমার আহলি বাইত। সুতরাং আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন এবং তাদেরকে পবিত্র করে দিন!" আমি তখন তাঁদের নিকটবর্তী হলাম। অতঃপর বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমিও কি আপনার আহলি বাইতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি জবাবে বললেন ঃ "নিশ্চয়ই, জেনে রোখো যে, তুমি কল্যাণের উপর রয়েছো। (ইবনু আবী হাতিম)

সাধারণ অবস্থা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে আবূ আইউব আনসারীর (রাঃ) গৃহে অবস্থান করেন। ফাতিমা (রাঃ)-এর বিয়ে হলে তিনি আলী (রাঃ)-কে একটা ঘর নিতে বলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহ থেকে কিছুটা দূরে একটা ঘর ভাড়া করেন। এই ঘরেই ফাতিমা (রাঃ)-কে তুলে নেন। তুলে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে (রাঃ) দেখতে যান। কথা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় কন্যাকে বলেন ঃ আমি তোমাকে কাছে রাখতে চাই। ফাতিমা (রাঃ) আরয করলেন আপনি হারিস ইবনু নুমান (রাঃ)-কে বললে তিনি আমাদের থাকার জন্য একটা ঘর দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কন্যা! হারিস ইবনু নুমান (রাঃ)-কে এমন কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। হারিস (রাঃ) এ সম্পর্কে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেন ঃ আমি জানতে পেলাম যে, আপনি ফাতিমা (রাঃ)-কে নিকটে কোন গৃহে রাখতে চান। আমার সমস্ত ঘর হাযির। আপনি ফাতিমা (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান। আমার জানমাল আল্লাহ-রাসূলের জন্য কুরবান। আল্লাহর কসম! আপনি যে জিনিস আমার কাছ থেকে নিবেন, তা আপনার কাছে থাকা আমার নিজের কাছে থাকার চেয়ে আমার কাছে বেশি প্রিয় হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। এরপর ফাতিমা (রাঃ)-কে হারিস ইবনু নুমানের (রাঃ) গৃহে স্থানান্তরিত করেন। (তাবাক্বাত)

একবার আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে এমন কিছু আচরণ হয়, যা ফাতিমা (রাঃ) সহ্য করতে পারেননি। তিনি বিষণ্ন মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হন। আলী (রাঃ)ও

পিছনে পিছনে গমন করেন। তিনি গিয়ে এমন স্থানে দাঁড়ান, যেখান থেকে তাঁদের উভয়ের কথা শুনতে পারেন। ফাতিমা (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধের অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কন্যা! আমি যা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শুন। এমন কথা কাটাকাটি কোন নারী-পুরুষ আছে, যাদের মধ্যে কখনো কোন মনোমালিন্য হয় না? আর পুরুষ সমস্ত কাজ নারীর ইচ্ছা অনুযায়ী করবে, তাকে কিছুই বলবে না? (তাবাক্বাত)

আলী (রাঃ)-এর উপর এ নীতিগত জবাবের এমন প্রভাব পড়েছিল যে, এরপর তিনি এমন কোন কাজ করেননি, যাতে ফাতিমা (রাঃ)-এর মন বিষণ্ন হতে পারে। আলী (রাঃ) নিজেই বলেন ঃ আমি ফাতিমা (রাঃ)-এর উপর যে কড়াকড়ি করতাম, তা থেকে নিবৃত্ত থাকি। আমি স্ত্রীকে বলি, আল্লাহর কসম! ভবিষ্যতে আমি এমন কোন কাজ করবো না, যাতে তোমার কষ্ট হয় বা তোমার মনে আঘাত লাগে।

পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলী (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-এর মধ্যে কখনো মনোমালিন্য হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে আপোষ করাতেন। তাদের মধ্যে আপোষ করে তিনি এক অস্বাভাবিক আনন্দ বোধ করতেন। আর একবার এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-এর ঘরে যান। এ সময় তাঁর চেহারায় দুঃখের কিছু ছাপ স্পষ্ট ছিল। তিনি উভয়ের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেন। তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁর চেহারা ছিল প্রফুল্ল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনি যখন ঘরে যান, তখন আপনার চেহারা ছিল বিবর্ণ, আর এখন হাশি-খুশি! তিনি বললেন ঃ আমি দু'ব্যক্তির মধ্যে আপোষ করিয়ে দিয়েছি, যারা আমার অতি প্রিয়। (তাবাক্বাত)

আবূ জাহালের ভাই ইবনু হিশাম ইবনু মুগীরা আলী (রাঃ)-কে

বলেন– তুমি আবূ জাহালের কন্যা গোরাকে বিয়ে কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'রআলী (রাযিঃ)-এর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর কাছে এটা অসহ্য লাগল [ফাতিমা (রাযিঃ) নিজেই কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানান]। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে গমন করেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর নিম্নোক্ত খুতবাহ্ পাঠ করেন ঃ

"وانى لست احرم حلالا ولاحل حراما ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكا نا واحدا أبدا"

আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে চাই না। কিন্তু আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা একসথানে মিলিত হতে পার না। **(মুসলিম [ইসলামীক সেন্টার, হাঃ ৬১২৮])**

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ খুতবাহ্ এতটা ক্রিয়া করেছে যে, 'আলী (রাযিঃ) ফাতিমার জীবদ্দশায় আর কোন বিয়ে করেননি। **(ইস্তিআব)**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গোপন কথা

ফাতিমা (রাঃ)-এর ২৯ বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু ফাতিমা (রাঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইনতিকালে ফাতিমা (রাঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হন। আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের আগে আমি তাঁর পাশে বসা ছিলাম। এ সময় ফাতিমা (রাঃ) আসেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলার ভঙ্গির সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-মারহাবা ইয়া বিনতু (কন্যা খোশ আমদেদ) বলে তাকে ডান দিকে বা বাম দিকে বসান। এরপর তাঁর কানে কিছু বললে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। এরপর আবার কানে কানে কিছু বললে তিনি হাসতে শুরু করেন। আমি বড় অবাক হলাম এবং ফাতিমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। ইতঃপূর্বে হাসি-কান্না এক সাথে দেখিনি। ফাতিমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ আমি কিছুতেই আমার পিতার গোপন তথ্য ফাঁস করবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর আমি ফাতিমা (রাঃ)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি যে, সেদিন হাসি-কান্নার কারণ কি ছিল? তিনি বললেন ঃ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাই আমি বলছি। প্রথমবার তিনি বলেছিলেন যে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম ইতঃপূর্বে বৎসরে একবার কুরআন শরীফ শুনাতেন। এ বছর তিনি দু'বার শুনিয়েছেন। এ থেকে মনে হয়, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। এতে আমি দুঃখিত হই এবং কাঁদতে থাকি। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার আহলি বাইতের মধ্যে সর্ব প্রথম তুমি আমার সাথে মিলিত হবে এবং তুমি জান্নাতে নারীদের সর্দার– এটা কি তোমার পছন্দ নয়, এটা শুনে আমি হাসতে থাকি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ফাতিমা (রাঃ) নিরাশ হয়ে বলেন হায়! আমার পিতার অস্থিরতা! সম্বিৎ ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আজকের পর তোমার পিতাকে আর অস্থির হতে হবে না। (তাবাক্বাত)

মৃত্যুকালীন অবস্থা

ফাতিমা (রাঃ)-এর আরও তিন বোন ছিলেন, তাঁরাও যৌবনেই বিদায় নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর ৬ মাস পর ১১ হিজরীর তৃতীয় রমাযানে ২৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। (ইস্তিআব)

তাঁর মৃত্যু-পীড়া সম্পর্কে ইতিহাসে কিছুই উল্লেখ নেই। অবশ্য এটা জানা যায় যে, কোন কঠিন পীড়ায় তাঁর ইন্তিকাল হয়নি। ফলে মৃত্যুর আগে তাঁকে অনেক দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়নি। উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, ফাতিমা (রাঃ)-এর ওফাতের সময় আলী (রাঃ) ঘরে ছিলেন না। ফাতিমা (রাঃ) আমাকে ডেকে পানির ব্যবস্থা করার জন্য বলেন। তিনি বলেন– আমি গোসল করবো। আমি পানির ব্যবস্থা করে কাপড় বের করে তাঁকে দেই। তিনি ভালরূপে গোসল করে কাপড় পরলেন। এরপর বললেন ঃ বিছানা পেতে দিন, আমি শোবো। আমি বিছানা পেতে দেই। তিনি কেবলামুখী হয়ে শুলেন। আমাকে বললেন ঃ বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি গোসল করেছি, তাই পুনরায় গোসল করার দরকার নেই। আমার দেহ খোলারও আর কোন প্রয়োজন নেই। এর পরই তিনি ইন্তিকাল করেন। আলী (রাঃ) ঘরে ফিরে এলে আমি তাঁকে এ ঘটনা জানালাম। তিনি তাঁকে পুনরায় গোসল না করিয়ে দাফন করেন। (তাবাক্বাত)

তাঁর জানাযায় খুব কম লোকেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে। এর কারণ এই যে, রাতের বেলা তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে আর আলী (রাঃ) তাঁর

ওয়াসিয়ত অনুযায়ী রাতের বেলাতেই তাঁকে দাফন করেন। (উসদুল গাবাহ)

তাবক্কাত গ্রন্থে এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

আলী (রাঃ) দাফন-কাফন শেষে ঘরে এলে তিনি তখন অত্যন্ত বিষণ্ন ছিলেন। শোক-দুঃখের আতিশয্যে তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

–আমি দেখছি, আমার মধ্যে দুনিয়ার অনেক রোগ ঢুকেছে।

আর দুনিয়াবাসী যতক্ষণ দুনিয়ায় আছে, সে তো রুগীই।

এক স্থানে মিলিত হওয়ার পর বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ জরুরী।

বিচ্ছেদের বাইরের যে সময় তা তো খুবই স্বল্প।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর ফাতিমা (রাঃ)-এর বিচ্ছেদ এ কথারই প্রমাণ যে,

বন্ধু চিরদিন থাকে না। (দুররুল মানসূর)

[ফাতিমা (রাঃ)-এর জীবনী সমাপ্ত]

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে **"প্রিয় নবীর কন্যাগণ (রাঃ)"** বইটি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করছি এবং সেই রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া 'আদায় করছি।

"আল-হামদু লিল্লাহ"